কিশোর গীতা

বেলুড় মঠের
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
প্রণীত

বিশ্বমাতা মন্দির
দক্ষিণেশ্বর, চব্বিশ পরগণা
১৩৫৮

নিবেদন

মূল গীতার সংস্কৃত বঙ্গানুবাদ এখন পঞ্চম সংস্করণে চলছে। এই পাঁচ সংস্করণে একচল্লিশ হাজার গীতা ছাপা হয়েছে। কিন্তু উহাতে মূল শ্লোকের সহিত অন্বয়, অনুবাদ ও পাদটীকা থাকায় উহা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী হয় নি। সেই জন্য অনেকের অনুরোধে কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করে এই গীতা লেখা হলো। এতে গীতার নির্য্যাস অধ্যায় অনুসারে গল্পচ্ছলে বলা হয়েছে। যে অধ্যায়ের যেটি প্রধান বিষয় সেটি সেই অধ্যায়ের শিরোনামারূপে ব্যবহৃত। গীতার মধ্যে সংস্কৃতের শক্ত আবরণের অন্তরালে যে মধুর ভাব-রস নিহিত তা এই পুস্তকে সহজ সরল বাংলায় সংক্ষেপে লিখিত। মূল গীতার সহিত কিশোর-কিশোরীদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কয়েকটি শ্লোক অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করেছি। সে গুলি মুখস্থ করলে মূল গীতার সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের প্রাথমিক পরিচয় হবে। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত বলে পুস্তকের প্রারম্ভেই এই মহাকাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছি। এতে গীতার পূর্বাভাসও পাওয়া যাবে। এটি না জানলে গীতার সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থাকবে। সকল হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতাই স্বদেশে বিদেশে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের কিশোর-কিশোরীদের কৈশোরেই গীতার সহিত পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

প্রাঞ্জলতার অনুরোধে মূল গীতার ভাব ও ভাষা থেকে কিশোর গীতা বেশী দূরে যায় নি। যদি এই গীতা মূল গীতা থেকে অধিক দূরে চলে যেত তাহলে কিশোর-কিশোরীরা মূল গীতার ভাব ও ভাষার অমূল্য সম্পদ্ হতে বঞ্চিত হতো। তাই এই পুস্তিকার অধিকাংশ সুবোধ্য ও কিয়দংশ দুর্বোধ্য লাগবে কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে।

দুর্বোধ্য অংশ বুঝবার চেষ্টা করলে বুদ্ধির উন্মেষ ও বিষয়ে প্রবেশ দুইই হবে। জটিল তথ্যকে সহজ ও সরল করবার জন্য কোথাও কোথাও নানা উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি গ্রন্থাবলী থেকে গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর সারগর্ভ উক্তিনিচয় মৎকর্তৃক সংগৃহীত, অনূদিত ও প্রবন্ধাকারে সজ্জিত হয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৩৪৭ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি এতে চতুর্থ অধ্যায়রূপে দেওয়া হলো। উহা সর্বাগ্রে পড়বার জন্য কিশোর-কিশোরীদের অনুরোধ করি। শক্ত শব্দগুলির অর্থ যথাস্থানে দেওয়া হলো। উপনিষদাবলী, মহাভারতের অবশিষ্ট অংশ ও ভাগবতাদি প্রসিদ্ধ শাস্ত্র থেকে বাক্যোদ্ধার করে গীতার সঙ্গে তাদের নিবিড় সংযোগ দেখান হয়েছে। মূল গীতার উপক্রমণিকারূপে এই গীতা স্বচ্ছন্দে পড়া যেতে পারে।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে এবং প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে আমার ডান হাত স্বরূপ ছিল পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ. এবং শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই পুস্তক প্রণয়ন বা প্রকাশন আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে। এই গ্রন্থের সমগ্র আয় দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বমাতা মন্দিরের সেবায় ব্যয়িত হবে। ইহা পাঠে কিশোর-কিশোরীগণ গীতাধর্মের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত হলেই আমার সব শ্রম সার্থক হবে। ইতি—

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া
গীতাজয়ন্তী বাসর
শুক্লা একাদশী
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

কিশোর গীতা

কিশোর গীতা

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ

কিশোর গীতা

এক

মহাভারত

রামায়ণের মতো মহাভারত আমাদের একটী প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। এদেশের প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। কাশীরাম দাস বাংলায় এর পদ্যানুবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।' সংস্কৃত মহাভারতের আদি নাম ভারত সংহিতা। ইহাতে ভারত বংশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ। মহাভারতের এক স্থানে এই কথা আছে। একদা দেবতারা সমবেত হয়ে তুলাযন্ত্রের এক দিকে চার বেদ এবং অন্য দিকে ভারত সংহিতা রাখলেন। তাতে দেখা গেল, ভারত সংহিতা চতুর্বেদ অপেক্ষা বেশী ভারী। তখন দেবতারা এই সংহিতার নাম দিলেন মহাভারত। মহাভারতকে পঞ্চম বেদও বলা হয়।

মহাভারত আঠার পর্বে বিভক্ত এবং লক্ষ শ্লোকে সমাপ্ত। মহর্ষি পরাশরের পুত্র ব্যাসদেব ইহার অমর রচয়িতা। চার বেদের বিভাগ কর্তা বলে ব্যাসদেব বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ব্যাসদেবের প্রার্থনা অনুসারে সিদ্ধিদাতা গণেশ মহাভারত লেখার ভার নিতে রাজী হন। তবে গণপতি প্রস্তাব করেন যে, শ্লোক রচনা বিলম্বিত হলে তাঁর লেখনী বন্ধ হয়ে যাবে এবং লেখনী বন্ধ হলে তিনি আর উহা ধরবেন না। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ব্যাসদেব পুনরায় গণপতির

কাছে প্রার্থনা কল্লেন, তাঁর মুখ-নিঃসৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য না বুঝে লেখক তা লিখতে পারবেন না। গণনায়ক এই প্রার্থনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হলে ব্যাসদেব মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ক্ষিপ্র লেখক গণেশকে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ বিরত রাখবার উদ্দেশ্যে ব্যাসদেব এই মহাকাব্যের স্থানে স্থানে ব্যাসকূট নামে বহু দুর্বোধ্য শ্লোক রচনা করেছেন।

মহাভারত রচনা সমাপ্ত হলে ব্যাসদেব তৎপুত্র পরমহংস শুকদেবকে সর্বাগ্রে এই মহাকাব্যে সুশিক্ষিত করেন। তৎপরে তিনি তাঁর শিষ্যগণকে ইহা শিক্ষা দেন। ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন গুরুর আদেশ অনুসারে রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের অবকাশে মহাভারত আবৃত্তি করেন। এইরূপে ক্রমশঃ এই গ্রন্থ জনসমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হয়। হাজার হাজার বছর ধরে মহাভারতের পুণ্য কাহিনী কোটী কোটী হিন্দুর গৃহে পঠিত ও কথিত হয়ে আসছে। ভারতের বাহিরে পারস্য, শ্যাম, জাভা, বালি প্রভৃতি দূর দেশেও এই সকল কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ জগতের প্রায় সর্বত্র এই মহাকাব্য বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতীয় প্রদেশসমূহের তো কথাই নাই; বহু বৌদ্ধ দেশের সাহিত্যে ও শিল্পে মহাভারতের গভীর প্রভাব বিদ্যমান। সুদূর মেক্সিকো দেশে মহাভারতের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে।

মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নামক নাটকে রাজা দুষ্মন্তের কথা আছে। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে এবং মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। এই ভরতরাজার বংশ-কাহিনী মহাভারতে বিবৃত। রাজা ভরতের প্রপৌত্রের নাম হস্তী। দিল্লীর সমীপে হস্তিনাপুরে রাজা হস্তীর রাজধানী ছিল। হস্তীর পৌত্র সম্বরণ

সূর্য্যতনয়া তপতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের পুত্রের নাম কুরু। কুরুরাজার নামানুসারে কুরুক্ষেত্রের নামকরণ হয়। কুরুক্ষেত্র কুরুরাজের ধর্মক্ষেত্র ছিল। কুরুর পাঁচ পুরুষ পরে রাজা শান্তনু আবির্ভূত হন। শান্তনু জাহ্নবী দেবীকে পত্নীরূপে পেয়েছিলেন। তাঁদের পুত্রের নাম ভীষ্মদেব। রাজা শান্তনু ব্যাস-জননী সত্যবতী দেবীকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে লাভ করেন। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ জাত হন। রাজকুমারদ্বয় নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে দুই মহিষী ছিলেন। অম্বিকার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার পুত্র পাণ্ডু। ব্যাসদেবের বরে উভয়ের জন্ম হয়।

অম্বিকা ব্যাসদেবের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভীতা হয়ে চক্ষু বন্ধ করেছিলেন। সেই দোষে তদীয়া সন্তান ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হন। ব্যাসদেবের ভীষণ আকৃতি দেখে অম্বালিকার দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়েছিল। এজন্য তাঁর সন্তান পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যান। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলে তাঁর অনুজ পাণ্ডু রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ধৃতরাষ্ট্রের মহিষীর নাম গান্ধারী। তাঁদের দুর্যোধন, দুঃশাসন, চিত্রসেন প্রভৃতি শতপুত্র লাভ হয়। রাজা পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই রাণী ছিলেন। তাঁদের পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। একই বংশজাত হলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কৌরব এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ পাণ্ডব নামে প্রধানতঃ অভিহিত। পাণ্ডু অল্পদিন রাজত্ব করবার পর দেহত্যাগ করেন।

পিতৃহীন পাণ্ডবগণ শৈশবে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের নিকট লালিত

পালিত হন। কৌরবগণ এবং পাণ্ডবগণ একত্রে দ্রোণাচার্য্যের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও সর্বগুণে অলঙ্কৃত হওয়ায় অচিরে প্রজাগণের পূজার্হ হয়ে ওঠেন। এতে কৌরবগণ ঈর্ষান্বিত হন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব হেতু রাজ্যভোগে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁর বংশধরগণ চিরকাল সিংহাসনের অনধিকারী থাকবেন, এটা কৌরবেরা নিতান্ত অসঙ্গত মনে করলেন। দুর্য্যোধনাদির পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুর থেকে বিদূরিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁদিগকে বারণাবত নগরে যেতে বলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ শিরোধার্য্য করে পঞ্চ পাণ্ডব মাতা কুন্তী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে বারণাবতে চলে যান। তথায় দুর্য্যোধনের নির্দেশে যে জতুগৃহ নির্মিত হয়েছিল তাতে পাণ্ডবেরা বাস করতে লাগলেন। তাঁদিগকে পুড়িয়ে মারবার জন্যই দুর্যোধন নানা দাহ্য পদার্থ দিয়ে সেই সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝতে পেরে এক রাত্রে সেই ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে উক্ত গৃহে সুরাপানে সংজ্ঞাহীনা এক নিষাদী তার পঞ্চ পুত্র সঙ্গে নিয়ে শুয়েছিল। জতুগৃহ ভস্মীভূত হবার সময় তারাও আগুনে পুড়ে মারা গেল। তাদের মৃতদেহ দেখে স্বার্থান্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্থির করলেন, সমাতৃক পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁদের শ্রাদ্ধাদি শেষ করে সেই মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রাজ্যে রটিয়ে দিলেন এবং ভাবলেন, তাঁর ছেলেরা এবার নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করবেন। কিন্তু ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

এদিকে পাণ্ডবেরা প্রাণভয়ে গৃহহীন হয়ে গহন অরণ্যাদি স্থানে লুক্কায়িত থেকে অতিকষ্টে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

তাঁরা ব্রাহ্মণবেশে নানা স্থানে ভ্রাম্যমাণ রইলেন। এরূপে দীর্ঘকাল অতীত হলে পাণ্ডবেরা পাঞ্চালরাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। দ্রুপদ রাজার দুহিতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণের আশায় ভারতের বিখ্যাত বীরবৃন্দ ও রাজগণ তথায় সমাগত হয়েছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তদগ্রজ বলরামও সেখানে গিয়েছিলেন। সমবেত বীরবৃন্দের মধ্যে কেহই লক্ষ্যভেদে সমর্থ হলেন না। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন সকলের সমক্ষে লক্ষ্যবিদ্ধ করে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণে কৃতকার্য হন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে নিজেদের আবাসে ফিরে এলেন এবং জননীর অনুজ্ঞাক্রমে সকলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করলেন। স্বয়ম্বর সভায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁদের পরিচয় ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হলো।

এই ঘটনায় পাণ্ডবদের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্যের একাংশ অধিকার করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র তাঁদিগকে আমন্ত্রণ করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ তদনুসারে খাণ্ডবপ্রস্থ নামক রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে রাজ্য চালাতে লাগলেন। অচিরে তাঁদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত হলো। তখন রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হলেন। সেই যজ্ঞ-সভায় নানা দেশের বীরবৃন্দ সমাগত হন। মহারাজ দুর্যোধনও মাতুল শকুনির সহিত যজ্ঞ দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি পাণ্ডবদের অভ্যুদয় দেখে ব্যথিত হলেন এবং পাণ্ডবগণকে অপদস্থ ও অপমানিত করবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কপট অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে শকুনির সাহায্যে পরাজিত করে তাঁদের সর্বস্ব অপহরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তদনুযায়ী যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় নিমন্ত্রিত হন। দ্যূতক্রীড়া ও সম্মুখ সমরে আহ্বান ক্ষাত্র ধর্ম অনুসারে অবশ্য গ্রহণীয়।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দ ও দ্রৌপদী সহ হস্তিনাপুরে অক্ষক্রীড়ায় যোগ দিতে গেলেন এবং শকুনির ষড়যন্ত্রে পাশাখেলায় পুনঃ পুনঃ পরাজিত হয়ে রাজ্য সম্পদাদি সর্বস্ব হারালেন। ফলে পাণ্ডবেরা তের বৎসর বনবাসে যেতে বাধ্য হলেন। এই তের বৎসরের মধ্যে তাঁরা বার বৎসর বনবাসী ও এক বৎসর অজ্ঞাত থাকবেন, এই সর্ত ছিল। বনবাসের অবসানে পাণ্ডবগণ এক বৎসর মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে অজ্ঞাত বাস করেন। বিরাটরাজের কন্যা উত্তরার সহিত অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়। অজ্ঞাত বাসান্তে পাণ্ডবগণ রাজ্যধন পুনঃ প্রাপ্তির আশায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমিত ভূমিও দিতে সম্মত হলেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের সভায় গিয়ে তাঁকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু দুর্যোধন নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন না। তখন পাণ্ডবগণ কৌরবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। এতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূত্রপাত হলো। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ অসংখ্য নারায়ণী সেনা দিলেন এবং স্বয়ং অভিন্ন-হৃদয় সখা অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করলেন।

কুরুক্ষেত্রে এই যুদ্ধের আয়োজন হলো। কৌরব পক্ষে এগার অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডব পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হয়েছিল। এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ হাতী, ৬৫৬১০ ঘোড়া, এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্য থাকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আঠার দিন ধরে চলেছিল। এই ভারত-সমরে সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত এবং আঠার অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হয়। অদ্যাপি ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কোন গুরুতর ব্যাপার হলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ করে থাকেন। কুরুক্ষেত্র অদ্যাপি বিদ্যমান এবং হিন্দু তীর্থরূপে পরিগণিত। ইহা পূর্ব

পাঞ্জাবে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবগণ পরাজিত এবং পাণ্ডবগণ জয়যুক্ত হন। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।" যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হয়। পাণ্ডবের সারথি ও সুহৃদ্ ছিলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁদের জয় হলো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের বিজয় সাধিত হয়েছে। ধর্মই ভারতের প্রাণ। মহাভারত একটী মহাকাব্যের নামমাত্র নয়। যেজন্য ভারত সংহিতার নাম দেবতারা মহাভারত রেখেছিলেন সেজন্যই মহাদেশ ভারতবর্ষের নাম শুধু ভারত না হয়ে মহাভারত হওয়া উচিত।

মহাভারতের মহিমা এই ভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে।—

পারাশর্য্য-বচঃ-সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেসরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জন-ষট্পদৈঃ অহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াৎ ভারত-পঙ্কজম্ কলিমল-প্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে ॥

পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের বাক্যরূপ সরোবরে জাত, হরিকথা-প্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত এবং নানা আখ্যানরূপ কেসরে শোভিত যে পদ্মের মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন সেই কলিকলুষ নাশক, গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপ পদ্ম সকলের কল্যাণকর হোক্।

———

দুই

গীতার ধ্যান

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বাম্ অনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥ ১

হে মাতা ভগবদ্‌গীতা, আপনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে কথিতা, ও প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব দ্বারা মহাভারতের মধ্যে গ্রথিতা। আপনি অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈতজ্ঞানরূপ অমৃতবর্ষিণী ও সংসার-নাশিনী ভগবতী। আমি আপনার ধ্যান করি। ১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্র-নেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২

হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনার নয়নযুগল প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রসদৃশ বিশাল। আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত করেছেন। আপনাকে প্রণাম করি। ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ ৩

আমি শরণাগতের নিকট কল্পবৃক্ষতুল্য, অশ্বচালনার্থ হস্তে বেত্র ও বল্গাধারী, গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও জ্ঞানমুদ্রাধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। ৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪

উপনিষদাবলী যেন গাভীসমূহ। সেই সকল গাভীর দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণ ও বৎস অর্জ্জুন। অমৃততুল্য গীতা যেন মহাদুগ্ধ এবং সুধীবৃন্দ এই দুগ্ধের ভোক্তা। ৪

বসুদেব-সুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকী-পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥ ৫

কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয় বিনাশকারী, জননী দেবকীর পরমানন্দদাতা, বসুদেবের পুত্র ও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ৫

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৬

যাঁর কৃপায় বোবা বক্তা হয় এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি। ৬

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৭

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও পবন দিব্য স্তব দ্বারা যাঁর স্তুতিগান করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ সহ বেদের দ্বারা যাঁর মহিমা কীর্তন করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্গতচিত্তে যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণ যাঁর অন্ত জানেন না সেই পরম দেবতাকে আমি প্রণাম করি। ৭

নবীন-মেঘ-সুন্দরং সুনীল-কমলচ্ছবিম্।
সুহাসরঞ্জিতাধরং নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্ ॥
যশোদানন্দনন্দনং সুরেন্দ্র-পাদবন্দনং।
সুবর্ণরত্নমণ্ডনং নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্ ॥
ভবাব্ধি-কর্ণধারকং ভয়ার্তি-শোকনাশকং।
মুমুক্ষুমুক্তিদায়কং নমামি কৃষ্ণসুন্দরম্ ॥ ৮

যিনি নবীন মেঘের মত সুন্দর এবং সুনীল পদ্মসদৃশ, যাঁর বদন হাস্যরঞ্জিত, সেই কৃষ্ণ-সুন্দরকে প্রণাম করি। যিনি নন্দ ও যশোদার আনন্দবর্ধক, দেবরাজ যাঁর পাদ বন্দনা করেন, যিনি সুবর্ণরত্নে মণ্ডিত সেই কৃষ্ণসুন্দরকে প্রণাম করি। যিনি সংসারসাগরের কর্ণধার, যিনি ভক্তের ভয়, আর্তি ও শোক নাশ করেন এবং মুমুক্ষুকে মুক্তি দেন সেই কৃষ্ণ-সুন্দরকে আমি প্রণাম করি।

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ৯

যিনি মীনরূপে বেদোদ্ধারকারী, কূর্মরূপে সর্ব লোক ধারণকারী, বরাহরূপে পৃথিবী উত্তোলনকারী, নৃসিংহরূপে দৈত্যদমনকারী, বামনরূপে বলিকে ছলনাকারী, পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়কুলনাশক, রামচন্দ্ররূপে রাবণবধকারী, বলরামরূপে হলধারী এবং বুদ্ধরূপে করুণা-বর্ধক এবং কল্কিরূপে ম্লেচ্ছের মূর্চ্ছাদায়ক—সেই দশরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

———

তিন

গীতার মহিমা

গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্বের ২৫শ অধ্যায়ে গীতা আরব্ধ এবং ৪২শ অধ্যায়ে সমাপ্ত। গীতা আঠারটী অধ্যায়ে বিভক্ত। এ গ্রন্থে সাত শত শ্লোক আছে। তন্মধ্যে ৬২০টি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এবং অবশিষ্ট ৮০টি শ্লোক ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয় ও অর্জুনের উক্তি। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরী বলেছেন, "মহাভারতে চারি বেদের সারার্থ সংগৃহীত। আর সমগ্র মহাভারতের সারাংশ গীতায় নিবদ্ধ। সেইজন্য গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ।' অর্থাৎ হে পৃথাসুত, গীতা আমার হৃদয়। গীতা-জ্ঞান দানের জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মহাভারতে আছে, 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা, কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।' অর্থাৎ বহু শাস্ত্র পাঠে কি লাভ? গীতাকেই উত্তমরূপে পড়া উচিত। চণ্ডীর ন্যায় গীতার অখণ্ড পাঠ এখনও প্রচলিত। কোথাও কোথাও গীতার নিত্য পাঠ হয়ে থাকে। সুর-তান-লয় যোগে গীতা কোন কোন স্থানে গীত হয়। মহারাষ্ট্রে গীতাব্যাখ্যা শুনতে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হন। বরোদা ও আমেদাবাদে যে সুবৃহৎ গীতামন্দির নির্মিত হয়েছে তাতে স্থাপিত গীতাদেবীর মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। বাঙ্গালোরে জনৈকা স্ত্রীভক্ত গীতার সাত শত শ্লোক কাপড়ের উপর রেশমের সেলাই দ্বারা লিখে

বড় বই প্রস্তুত করেছেন। বাঙ্গালোরে থাকবার সময় সেটী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এমন অনেক সাধক এবং পণ্ডিত এখনও আছেন সমগ্র গীতা যাঁদের কণ্ঠস্থ। কোন কোন স্কুলে বা কলেজে গীতা পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্বাচিত হয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে গীতা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হতে বিনিঃসৃত হয়েছিল। তাই এই পুণ্যবাসরে গীতা জয়ন্তী ভারতের নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

গীতা পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সকল হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য নরনারী শ্রদ্ধাভরে গীতা পড়েন। জার্মাণ মনীষী উইলিয়ম ভন হামবোল্ট বলেছেন, "গীতার মত সুললিত, সুসত্য, সুগভীর ধর্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।" বালগঙ্গাধর তিলকের মতে গীতার তুল্য অপূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। মহাত্মা গান্ধী বলেন, "গীতা মানবের পারমার্থিক জননী। আমার জননীর মৃত্যুর পর গীতা আমার জীবনে তাঁর স্থান অধিকার করেছে।" স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "উপনিষদোক্ত ধর্মতত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করে গীতারূপ সুদৃশ্য মালা গাঁথা হয়েছে।"

ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনীষীদ্বয় কার্লাইল ও এমার্সনের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন। বিদায়কালে কার্লাইল এমার্সনকে একখানি গীতা উপহার দেন। গীতা উক্ত মার্কিন মনীষীর জীবনে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা তাঁর বইগুলি পড়লে বুঝা যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছত্রিশটী ভাষায় আজ পর্য্যন্ত গীতার পাঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ

আছে। ১৭৮৫ খ্রীঃ গীতার প্রথম ইংরাজি অনুবাদ লণ্ডনে প্রথম মুদ্রিত হয়। বাংলার ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসের মতে গীতাতত্ত্বই ভারতীয় ভাবধারার পূর্ণতম পরিণতি ও সূক্ষ্মতম নির্য্যাস। মোগল সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারাশিকো লিখেছেন, "গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।"

মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন। পণ্ডিতগণ অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে গীতা রচিত হয়েছিল। বাইবেল, কোরাণ এবং ত্রিপিটক অপেক্ষাও গীতা প্রাচীনতর। গীতার উপর বহু ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃতে রচিত হয়েছে। শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি আচার্যগণ সংস্কৃতে গীতার টীকাদি লিখেছেন। ভারতের জীবিত ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র মারাঠীতে গীতার ব্যাখ্যা আছে। উক্ত ব্যাখ্যা মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরু জ্ঞানেশ্বরের রচনা। গীতার টীকাকারদের মধ্যে মধুসূদন সরস্বতী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালী। কিন্তু এঁদের টীকা সংস্কৃতে রচিত। গীতার আধুনিক ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক ও অরবিন্দ ঘোষ প্রসিদ্ধ। উভয়ের মৌলিক ব্যাখ্যা আদিতে ইংরাজিতে লিখিত এবং অধুনা বাংলায় অনূদিত।

মহাভারতকে যেমন পঞ্চম বেদ বলা হয় গীতাকে তেমনি উপনিষদ্ বলে। বেদের সার উপনিষদে এবং মহাভারতের সার গীতায় নিহিত। উপনিষদের মূল তত্ত্ব গীতায় ব্যাখ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণ

দেব বল্‌তেন, "কয়েক বার 'গীতা' 'গীতা' বল্লে যা হয় তা গীতার শিক্ষা।" অর্থাৎ ত্যাগই গীতার বাণী। জার্মাণ মনীষী গোটে বল্‌তেন, "তোমাকে সব কাজ এক সময় ছাড়তেই হবে।—এই শাশ্বত সঙ্গীত অনন্ত কাল ধরে আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। সমগ্র জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে এই অনাহত সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবেশ কচ্ছে। কিন্তু আমরা তা শুনি না।" অনুষ্ঠিত কর্মের ফল কামনা না করা—নিষ্কাম ভাবে জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা করাই গীতার মর্মকথা। স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌তেন, "বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা এবং জিশু খ্রীষ্ট প্রার্থনা সহায়ে যে দিব্য অবস্থায় আরূঢ় হয়েছিলেন নিষ্কাম কর্মীও সপ্রেম সেবা দ্বারা সেই অবস্থা লাভ করতে পারেন।" গীতায় হিন্দুধর্মের সর্বভাবের সমন্বয় দেখা যায়। একমাত্র গীতার ভিত্তিতে সকল হিন্দু সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। গীতার ধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর জীবনী পড়লে গীতার সমন্বয় বাণী বুঝতে পারা যায়। গীতায়, মহাভারতে হিন্দু ধর্মের যে সমুজ্জ্বল স্বরূপ অভিব্যক্ত সেটাই হিন্দু ধর্মের আসল স্বরূপ, সমগ্র স্বরূপ। আমাদের ধর্মের এই স্বরূপ যখনি বিকৃত হয়েছে তখনি কোন ধর্মগুরু আবির্ভূত হয়ে হিন্দু ধর্মকে শাশ্বত স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব যখন হিন্দু ধর্মের উপর পড়লো তখন সারা ভারতে বেদমূর্তি শঙ্করাচার্য্য উপনিষদাবলী প্রচার করলেন। মধ্যযুগের শেষে সেমিটিক ধর্মসমূহের দ্বারা যখন হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত হলো তখন এলেন দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ ও বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, বিবেকানন্দের বাণীতে গীতার ধর্মই নির্ঘোষিত। হিন্দু ধর্ম দুইরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে—সনাতন ধর্মে ও যুগ-ধর্মে। সনাতন ধর্মের

মূলসূত্রগুলি দেশে দেশে যুগে যুগে অপরিবর্তিত থাকে। আর সেই চিরন্তন মৌলিক ভাবরাশি দেশকালের উপযোগী হয়ে প্রকটিত হলেই যুগধর্ম নামে অভিহিত হয়। এক যুগের ধর্ম তাই অন্য যুগের ধর্ম থেকে ভিন্ন হয় বাহ্য অনুষ্ঠানে, যদিও মূলতঃ দুইই অভিন্ন। গীতায় হিন্দুধর্মের সনাতন স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক। সেজন্য উপনিষদের পরেই গীতা স্থান পেয়েছে।

কলিকাতার বাঁশতলা গলিতে যে গীতা গ্রন্থাগার আছে তাতে পৃথিবীর সাতাশটা ভাষায় মুদ্রিত গীতার এগার শত সংস্করণের নমুনা দেখা যায়। বাঁকুড়া সহরে গোয়েংকা হাই স্কুলের দেওয়ালে গীতার সাত শত শ্লোক বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে। বার বার সেগুলি পড়ে ছাত্রছাত্রীদের অনায়াসে মুখস্থ হয়ে যায়। গীতার মূল শ্লোকগুলি সুর করে আবৃত্তি করলে মর্মস্পর্শী ও ভাবোদ্দীপক হয়।

চার

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

গীতার তুল্য ধর্ম্মগ্রন্থ আর নেই। গীতা শ্রীকৃষ্ণের মর্মবাণী। শ্রীকৃষ্ণ জাতিবর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য অধ্যাত্ম জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শনের দ্বার গীতায় উন্মুক্ত করেছেন। জন্ম ও জীবনের স্তরভেদ অনুযায়ী নানা কর্তব্যের কথা গীতায় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত। অবিরাম কর্ম করে যাও; কিন্তু কর্মে কখনো আসক্ত হয়ো না, বা কর্মফলের অপেক্ষা করো না। মনে রেখো, সংসারের সঙ্গে তোমার কোন সংশ্রব নেই। সংসারে যে কর্ম করছ তা তোমার নিজের জন্য নয়; তা পরার্থে। ভুলিও না, পরোপকারায় স্বর্গায়। অনাসক্ত কর্ম দ্বারাই জীবন-সমস্যা যথার্থভাবে মীমাংসিত হয়। সংসার ত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই। সাক্ষীবৎ সকলের সেবা করে যাও নিঃস্বার্থভাবে। তীব্র কর্মের মধ্যে স্থাণুবৎ স্থিরতা চাই। জগৎ উল্‌টে গেলেও সে স্থিরতা ভঙ্গ হবে না। ইহাই গীতার নিগূঢ় রহস্য। ইহাই গীতার মুখ্য বাণী। দিবারাত্রি অবিরত কর্ম কর; কিন্তু দেখো যেন চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট না হয়, আসক্তি যেন এসে না পড়ে। ইহাই গীতার সার কথা। কর্তব্যকে পরিহার করো না, কর্মকে এড়িয়ে চলো না। কর্মের মধ্যেও যিনি চিত্ত স্থির রাখেন তিনিই কর্মকৌশল অবগত হন। অনেকে বলেন, ফলাকাঙ্ক্ষা না করে বা অনাসক্ত হয়ে কাজ করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্য নয়। নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্মের কৌশল তাঁরা জানেন না।

পরিব্রাজক যেমন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে মাঝে মাঝে কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষলতা-সমাবৃত অরণ্যের মধ্যে সুদৃশ্য গোলাপকুঞ্জ দেখতে পান সেরূপ অনেকে নানা শাস্ত্র পড়ে শেষে উপনিষদে চরম সত্যের সন্ধান পেয়ে ধন্য হন। উপনিষদাবলীর সারতত্ত্ব গীতায় পাওয়া যায়। গীতা যেন অবচিত পুষ্পগুচ্ছের একটি সুন্দর মালা। ইহার প্রত্যেকটি ফুল সুবিন্যস্ত ও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট। উপনিষদে ভক্তি-ভাব নিতান্ত বিরল। কিন্তু গীতায় ভক্তিতত্ত্ব যে কেবল পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট রয়েছে তা নয় ভক্তির অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি এতে পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গীতার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধর্মমতের সামঞ্জস্য সাধনে। ধর্মসমন্বয়ের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা গীতায় দেখা যায়। গীতা কোন ধর্মমতকে ছোট করে দেখেন না। গীতা কোন ধর্মমতের প্রতি ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা করেন না। ধর্মসমন্বয় ও কর্মে অনাসক্তি—এই দুটি গীতার প্রধান বাণী। আমরা হিন্দু। আমাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ। গীতা এই বেদের ভগবৎমুখনিঃসৃত শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। গীতা অপেক্ষা বেদের আর কোন উৎকৃষ্টতর ভাষ্য রচিত হয় নি এবং রচিত হওয়া সম্ভবও নয়।

গীতা ভারতের সর্বোত্তম ধর্মগ্রন্থ এবং হিন্দু ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের অতি প্রিয়। মার্কিন মনীষী এমার্সনের ভাববাদের উৎস সন্ধান করতে গেলে জানা যায় যে, তিনি গীতা থেকেই উহার আদি প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি যখন কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ করতে যান· তখন কার্লাইল প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ একখানি গীতা তাঁকে উপহার দেন। এমার্সনের বাসভূমি কংকর্ড থেকে যে ভাবস্রোত সমগ্র আমেরিকায় প্রবাহিত হয়েছে তার মূলে আছে আমাদের এই

ক্ষুদ্রকায় ধর্মগ্রন্থ গীতা। আমেরিকার সমস্ত মহৎ আন্দোলনই এক ভাবে না এক ভাবে কংকর্ড আন্দোলনের নিকট ঋণী।

গীতা বলেছেন, আসক্তিই সমস্ত দুঃখের মূল এবং অনাসক্ত কর্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। কোনটি কর্ম এবং কোনটি অকর্ম তা নির্ণয় করতে গিয়ে পণ্ডিতগণও মহাভ্রমে পড়েছেন। যে কর্ম দ্বারা ধর্মভাব বাড়ে ও হৃদয়ের বিস্তার হয় তাহাই কর্তব্য। আর যে কর্ম দ্বারা বিষয়বাসনা বাড়ে এবং দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ হয় তাহাই অকর্তব্য। সুতরাং দেশকালপাত্রভেদে কর্ম ও অকর্ম নির্দিষ্ট হওয়া সমীচীন। যাগযজ্ঞাদি কর্ম সেকালের উপযোগী ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু একালে সেগুলির আর উপযোগিতা নেই। এ যুগে নিষ্কাম কর্ম, সপ্রেম সেবাই যাগযজ্ঞতুল্য পুণ্যপ্রদ। গীতার বাণী কোন যুগের বা কোন দেশের বা কোন ধর্মের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। গীতার বাণী সর্বযুগের, সর্বদেশের ও সর্বমানবের উপযোগী। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মের আকার ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সর্বাবস্থাতেই সকল কর্মে অনাসক্তি অভ্যাস করা যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয়ের সর্ব শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। তিনি এসেছিলেন মানবের জীবনযাত্রায় বেদান্তকে সক্রিয় করে তুলতে। পৃথিবীকে সর্বাপেক্ষা মহৎ শিক্ষা দিয়েছেন গীতা। যিনি গীতা উপদেশ দিয়েছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের মতো গভীর প্রজ্ঞা ও অলৌকিক প্রতিভা জগতের অপর কোন ধর্মগুরুর মধ্যে দেখা যায় না। যে সকল দেবমানব বহু শতাব্দীর পর অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে বিশাল ধর্ম-জাগরণ সৃষ্টি করেন গীতার উপদেষ্টা তাঁদের অন্যতম।

ভারতে অন্যান্য অবতার অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের পদানুগ নরনারীর সংখ্যা অধিকতর। শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভা জগতে অতুলনীয়। তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের কাছে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছিল তাঁর জীবনের প্রত্যেক স্তরে। তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা, আদর্শ পুত্র, সহৃদয় সখা, কর্তব্যনিষ্ঠ রাজা, উৎকৃষ্ট যোগী, শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য্য এবং আরও কত কি!

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতত্ত্বের জীবন্ত মূর্তি। আমরা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সর্বতোমুখী প্রতিভায় অভিভূত হই। তিনি একাধারে আদর্শ ত্যাগী ও আদর্শ গৃহী। তিনি আশ্চর্য্য কর্মী, আবার অদ্ভুত নিষ্কাম। গীতা ব্যতীত তাঁকে বোঝবার উপায় নেই। তিনি ছিলেন স্বকীয় বাণীর মূর্ত বিগ্রহ। গীতার বাণী শ্রীকৃষ্ণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্তির অতুলনীয় আদর্শ, ভারতের জাতীয় দেবতা। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, কর্মের জন্যই কর্ম এবং কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য—ধর্মজগতের এই নিগূঢ় রহস্য তাঁর জীবনে প্রকটিত হয়। এই মহাসত্য অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের জীবন বেদ থেকেই জগতে প্রচারিত হয়েছে। আর সেই শাশ্বত সত্যের আবির্ভাব ঘটেছে সর্বপ্রথম এই ভারত-তীর্থে। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি পৃথিবীর মানুষ ছিলেন না। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উভয় সেনাদলের মধ্যে অর্জুনের মহারথের পুরোভাগে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কি অনির্বচনীয় মাধুর্য্য ও মহিমা ফুটে উঠেছে! কি অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও স্থৈর্য্য সেই মূর্তিতে! যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ কোলাহলের মধ্যেও তিনি সুস্থির ও সমাহিত। সমরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি অর্জুনকে গীতোক্ত উপদেশ

দিচ্ছেন, ধর্মযুদ্ধে প্রণোদিত এবং ক্ষাত্র ধর্মপালনে উৎসাহিত কচ্ছেন। তিনি স্বয়ং এই ভীষণ মহাসমরের প্রধান নিয়ামক। কিন্তু কর্মে তাঁর আদৌ আসক্তি নেই, তিনি যুদ্ধে অস্ত্রধারণও করেন নি! যেদিক দিয়েই দেখ না কেন, কৃষ্ণচরিত্র সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির সমন্বয় মূর্তি। বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয় বাণীর ব্যাপক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। এ যুগে চাই কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভগবদ্‌গীতার সিংহনাদ। বৃন্দাবনের বংশীধর কৃষ্ণের পূজা এখন বন্ধ থাক্। এ যুগে জড়ের মত ঘরে বসে থাকলে চলবে না। ব্যক্তিগত সুখেচ্ছা বিসর্জন দিয়ে একাগ্র চিত্তে বীরের মতো কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। কর্ম, কর্ম, কর্ম; কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্যনাদে ঘোষণা করেছেন গীতায়।

মৃতপ্রায় ভারত মোহনিদ্রায় নিমগ্ন। হে ভারত, অর্জুনের মত ক্লীবতা, কর্তব্যমূঢ়তা পরিত্যাগ করে পুনরায় জাগ্রত হও। শ্রীকৃষ্ণের বাণী হৃদ্গত করে তাঁর অলৌকিক চরিত্রকে মাথায় রেখে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হও এবং অনন্ত চিত্তস্থৈর্য্য লাভ কর।

———

পাঁচ

অর্জুনের বিষাদ

কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধ দেখবার জন্য অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুৎসুক হলেন। সেজন্য ব্যাসদেব তাঁকে দিব্য চক্ষু দিতে চাইলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র স্বচক্ষে প্রিয়জনের নিধন দেখতে অস্বীকার করলেন; তবে যুদ্ধের বর্ণনা শুনতে আগ্রহান্বিত হলেন। তখন ব্যাসদেব অন্ধরাজের অমাত্য সঞ্জয়কে দিব্য চক্ষু দিলেন। সঞ্জয় ব্যাস-দত্ত দিব্য চক্ষুর দ্বারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখে, তত্রত্য ব্যক্তিবৃন্দের কথা শুনে এবং তাঁদের মনোভাব জেনে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হুবহু বর্ণনা করলেন। সঞ্জয়ের বাক্যই সমগ্র গীতায় নিবদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসু মৎপুত্রগণ এবং পাণ্ডবেরা সমবেত হয়ে কি করলেন?" তদুত্তরে সঞ্জয় বললেন, রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্য সমূহকে ব্যূহাকারে সজ্জিত দেখে দ্রোণাচার্যের নিকট গেলেন। দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষাত্র ধর্ম অবলম্বনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে পাছে তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন এবং স্বধর্মে ফিরে আসেন—এই ভয়েই দুর্যোধন সেনাপতি ভীষ্মের কাছে না গিয়ে রণগুরু দ্রোণের কাছে গেলেন।" রাজা নিজ গুরুকে প্রণাম করে বললেন, "আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সৈন্যব্যূহ রচনা করেছেন। আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিপুল সৈন্যসজ্জা দেখুন। এই পাণ্ডবসেনার মধ্যে আছেন সাত্যকি, মৎস্যরাজ বিরাট, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, যদুবংশীয় চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, রাজা কুন্তীভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমশালী

যুধামন্যু, মহাবীর উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র এবং ঘটোৎকচাদি বীরগণ। এঁরা সকলে মহাধনুর্ধর এবং মহারথ। এঁদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে ভীমার্জুনের সমকক্ষ।"

তারপর রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে স্বপক্ষীয় বিশিষ্ট যোদ্ধাদের নাম শোনালেন। তাঁর পক্ষে দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ছিলেন। এঁরা ছাড়া আরও অনেক বীর যোদ্ধা ছিলেন, যাঁরা সমরে বিশারদ ও নানা শস্ত্রনিক্ষেপে সুদক্ষ। এই শূরগণ সকলেই দুর্য্যোধনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কৌরবপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অধিক এবং পাণ্ডবপক্ষে সৈন্যসংখ্যা স্বল্প হলেও কৌরবপক্ষের সৈন্যবল অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সৈন্যশক্তি অধিকতর—এই ধারণা দুর্য্যোধনের মনে উদিত হয়েছিল। কারণ তাঁদের সেনাপতি ভীষ্ম উভয় পক্ষের পিতামহ বলে উভয় পক্ষপাতী ছিলেন। আর পাণ্ডব সেনাপতি ভীম এক পক্ষপাতী। কৌরব সৈন্যসমূহের ব্যূহদ্বারে অবস্থিত হয়ে সেনাপতি ভীষ্মকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করবার জন্য দ্রোণাদি যোদ্ধৃগণকে দুর্য্যোধন অনুরোধ জানালেন। তখন ভীষ্ম সিংহনাদতুল্য ভীষণ শঙ্খধ্বনি করলেন। তা শুনে দুর্য্যোধনের হৃদয় হর্ষিত হলো।

অনন্তর অগণ্য শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, মৃদঙ্গ ও রণশিঙ্গা বেজে উঠলো। সেই তুমুল রণবাদ্য ভীষণ আকার ধারণ করলো। যুদ্ধক্ষেত্রে বহু শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথিরূপে আরূঢ় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীম পৌণ্ড নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, সহদেব

মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজালেন। কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজ, সাত্যকি, দ্রুপদ, অভিমন্যু এবং প্রতিবিন্ধ্যাদি বীরগণের শঙ্খসমূহ পৃথক্ পৃথক্ বেজে উঠলো। পাণ্ডবগণের সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করলো।

অর্জুন যে রথে আরূঢ় ছিলেন তার পতাকা বানর-চিহ্নিত ছিল। তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখে অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হলেন এবং স্বীয় ধনু গাণ্ডীব হাতে নিয়ে হৃষিকেশকে বল্‌লেন, "হে অচ্যুত, আপনি উভয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ রাখুন। যাঁরা যুদ্ধার্থ এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের আমি দেখ্‌তে চাই। তদনুসারে পার্থ-সারথি উভয় সেনাদলের মধ্যে এবং ভীষ্মদ্রোণাদি বীরগণের সম্মুখে কপিধ্বজ রথ এনে রাখলেন এবং কৌরবপক্ষের সেনাদলকে দেখবার জন্য অর্জুনকে বল্‌লেন। পার্থ তথায় উভয় সেনাদলের মধ্যে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্মাদি পিতামহগণ, দ্রোণাদি আচার্যগণ, শল্যাদি মাতুলগণ, ভীম ও দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, লক্ষ্মণাদি পুত্রগণ, অশ্বত্থামাদি বন্ধুগণ, দ্রুপদাদি শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি সুহৃদ্‌গণকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত দেখে করুণার্দ্র হলেন। তিনি দুঃখ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণকে বল্‌লেন, "স্বজনগণকে যুযুৎসু দেখে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে, আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত এবং যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

"আমার হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে। হে কেশব, আমি আর স্থির থাকতে পাচ্ছি না। আমার মাথা ঘুরছে। আমি অশুভ লক্ষণ দেখ্‌ছি। আমি মনে করি না, যুদ্ধে স্বজনদের বধ করলে আমার মঙ্গল হবে। আমি যুদ্ধে বিজয় চাহি না, রাজ্য ও সুখ কামনা

করি না। হে গোবিন্দ, রাজ্য লাভে বা বিষয় ভোগে বা জীবন ধারণে আমাদের কি প্রয়োজন? কারণ যাঁদের জন্য রাজ্যাদি কাঙ্খিত তাঁরা সকলেই প্রাণ ও ধনাদির আশা ছেড়ে এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। হে মধুসূদন, এঁরা আমাদিগকে বধ করলেও ত্রৈলোক্য-রাজ্যের নিমিত্তও আমরা এঁদের বধ করতে চাই না। পৃথিবীমাত্র রাজ্যের জন্য যে এঁদের হত্যা করতে ইচ্ছা করি না, তা বলাই বাহুল্য। হে জনার্দন, কৌরবগণকে বিনাশ করলে আমরা কি সুখী হতে পারবো? এই সকল আততায়ীকে বধ করলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করবে। শাস্ত্রে আছে, যে ঘরে আগুণ লাগায়, যে লোককে বিষ খাওয়ায়, যে অন্যের বধার্থ অস্ত্র ধরে, এবং যে ভূমি, ধনসম্পদও পর দারা আত্মসাৎ করে, সে ছয়জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্র মতে আততায়ীর বধ বিহিত হলেও ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আচার্য্য বা গুরুজন হলে আততায়ী তাঁকে বধ করা নিষিদ্ধ। তাই এঁদের বধ করলে ধর্মশাস্ত্র মতে আমরা পাপভাগী হবো; ইহলোকে বা পরলোকে আমাদের আর কোন মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। সুতরাং দুর্য্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ করা আমাদের উচিত নয়। এঁদের চিত্ত রাজ্যলোভে অভিভূত হয়েছে। তাই কুলক্ষয়ে ও মিত্রদ্রোহে যে পাতক হয় তা এঁরা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু আমরা যখন কুলক্ষয়ের পাপ দেখতে পাচ্ছি, তখন কেন সেই পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত হবো না? কুলনাশে চিরাচরিত কুলধর্ম নষ্ট হয় অনুষ্ঠাতার অভাবে। আবার কুল নষ্ট হলে অনাচাররূপ অধর্মে কৃৎস্ন[১] কুল নিমজ্জিত হয়। যদি কুল অধর্মে লিপ্ত হয় তা হ'লে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়।

---

১ সমগ্র।

হে বাষ্ণেয়[1], কুলনারীরা দুষ্টা হলেও বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। মনুসংহিতায় আছে, অধম বর্ণের পুরুষের সহিত উত্তম বর্ণের কন্যার বিবাহ এবং মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা এবং সমান-প্রবরা কন্যার সহিত বিবাহ এবং বর্ণগত কর্মত্যাগ—এই তিন প্রকারে বর্ণসঙ্কর[2] হয়। নারদ সংহিতার মতে উত্তম বর্ণের নারীর গর্ভে অধম বর্ণের পুরুষের ঔরসে সন্তান জন্মিলে বর্ণসঙ্কর ঘটে। বর্ণসঙ্কর হলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাঁদের পিতৃপুরুষগণ নরকে পড়েন। এই সকল বর্ণসঙ্কর-কারক দোষের দ্বারা কুলঘ্নগণের সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম উৎসন্ন হয়। হে কৃষ্ণ, যাদের কুলধর্মাদি উৎসন্ন হয়েছে তাদের নিরন্তর নরকে বাস করতে হয়, একথা আমরা শাস্ত্র ও আচার্যের মুখে শুনেছি।”

স্বজনবধে উদ্যত হয়ে অর্জুন অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আবার বল্লেন, “হায়! আমরা কি মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি! আমরা রাজ্য ও সুখের লোভে স্বজনকে বধ করতে উদ্যত! আমি যখন নিরস্ত্র এবং প্রাণরক্ষার্থ নিশ্চেষ্ট থাকবো তখন যদি সশস্ত্র ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে বধ করেন তাতে আমার অধিক কল্যাণ হবে।” এই বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকাকুল চিত্তে রণাঙ্গনে রথোপরি বসে পড়লেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদ বিবৃত হয়েছে। এজন্য প্রথম অধ্যায়ের নাম বিষাদযোগ। কারণ, বিষাদ দ্বারা অর্জুন ভগবানের সঙ্গে

---

১ বৃষ্ণি-বংশে জাত। যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন সেই বংশের জনৈক রাজার নাম বৃষ্ণি। তাই শ্রীকৃষ্ণের এক নাম বাষ্ণেয়।

২ বর্ণের সংমিশ্রণ।

যুক্ত হয়েছিলেন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি যোগের বর্ণনা আছে। তাই গীতার আর একটি নাম যোগশাস্ত্র। অর্জুনের বিষাদ দূর করবার জন্য ভগবান্ যে উপদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে দিয়েছিলেন তা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আরম্ভ হয়েছে। অর্জুন প্রশ্ন কচ্ছেন, আর শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন। এইভাবে সমস্ত গীতা রচিত। তাই গীতার নাম কৃষ্ণার্জুন সংবাদ। কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কি করে অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিলেন? তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মৃত্যুর সম্মুখীন হলেই মনে তত্ত্বজিজ্ঞাসা ওঠে, আত্মস্বরূপ জানতে ইচ্ছা হয়।

রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস যে যুদ্ধে নিহত হন সেই যুদ্ধে যাবার পূর্বে তিনি রোম নগরের বিশিষ্ট বিদ্বান্‌গণকে স্বীয় প্রাসাদে ডেকে এনে তিন দিন ধরে দর্শনের আলোচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন এক স্থানে দেখ্‌লেন, কোন পণ্ডিতের গীতা-পাঠ শুনে একটী ভক্তিমান্ শ্রোতা কাঁদছে। মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গীতার কোন উপদেশটি তোর এত ভাল লেগেছে যার জন্য তুই কাঁদ্‌ছিস্?" সে বল্‌লে, "প্রভো, আমি মূর্খ, গীতার ব্যাখ্যা কিছু বুঝতে পারছি না। তবে যখন পণ্ডিত মশাই কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন দেখতে পেলাম, যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপর ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ অর্জুনকে গীতোক্ত উপদেশ দিচ্ছেন। তা দেখে আমি অশ্রুসম্বরণ করতে পারছি না।" শোনা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ভগ্নি নিবেদিতার মনে সন্দেহ উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে কুরুক্ষেত্র তীর্থে অবস্থানকালে তিনি ভাবনেত্রে উপরোক্ত দিব্য দৃশ্য দেখেছিলেন।

ছয়

আত্মার স্বরূপ

অর্জুন দয়ার্দ্র হয়ে উপরোক্ত প্রকারে শোক করতে লাগলেন। বিষাদে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিরস্কার করে বললেন, "তোমার এই মোহ অনার্য্যোচিত এবং অকীর্তিকর।" আর্য্য অর্জুনকে অনার্য্য বলে ভৎ র্সনা করে ভগবান আবার বললেন।—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

হে অর্জুন, ক্লীবতা আশ্রয় করো না। এই কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধার্থ উত্থিত হও।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "গীতার বজ্রবাণী এই শ্লোকে নিনাদিত। কঠোর কর্তব্যের সম্মুখে অর্জুনের মত আমরা অনেকেই ক্লীবভাব প্রাপ্ত হই। স্বার্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পায়ে ঠেলে যখন মানুষ বৃহত্তর কর্তব্য পালনে এগিয়ে যায় তখন তার মধ্যে মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে, শক্তির স্ফুরণ হয়। বর্ণোচিত ও আশ্রমগত কর্তব্যকে গীতায় স্বধর্ম বলা হয়েছে। এই স্বধর্ম পালনে মানুষ যখন প্রাণপণ চেষ্টা করে তখনই তার জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।

ভগবানের তিরস্কার শুনে অর্জুন বললেন, "হে মধুসূদন, ভীষ্ম-দ্রোণাদি আমাদের পূজার্হ। তাঁদের সঙ্গে কিরূপে যুদ্ধ করি?

যাঁদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করাও অনুচিত তাঁদের সহিত বাণযুদ্ধ করা কি সঙ্গত ? মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করে সামান্য ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করলেও আমার মঙ্গল হবে। তাঁদের বিনাশ করে আমি কোন ভোগ্য বিষয় লাভ করতে চাই না। যাঁদের বধ করে আমি বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না তাঁরাই সম্মুখে যুদ্ধার্থ অবস্থিত রয়েছেন। আমাদের বিজয় বা পরাজয় কোন্‌টি শ্রেয়স্কর তা বুঝতে পারছি না। দৈন্যদোষে আমার ক্ষাত্র স্বভাব অভিভূত এবং চিত্ত স্বধর্মে বিমূঢ় হয়েছে। আমার পক্ষে যা শ্রেয়স্কর আপনি নিশ্চয় করে তা বলুন। 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।" এই সকল বলার পর অর্জুন যুদ্ধ করবো না বলে নীরব হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা ছিলেন। কিন্তু অর্জুন যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে এবং নিজেকে শিষ্যরূপে ভাবতে পারলেন ততক্ষণ তিনি স্বীয় কর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হলেন না, বা শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গীতোক্ত ধর্ম উপদেশ দিলেন না। শিষ্যত্ব একটি সুমহৎ মনোভাব। এটি যার না থাকে সে গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করতে পারে না। গাভী যেমন বৎসকেই দুধ দেয় গুরু তেমন শিষ্যকেই জ্ঞান দেন। একলব্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি দ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু গুরু যখন তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে অনিচ্ছুক হলেন তখন তিনি বনে গিয়ে দ্রোণের মূর্তি গড়ে উহার সম্মুখে যুদ্ধবিদ্যা শিখলেন। তাঁর মধ্যে শিষ্যভাব এসেছিল বলেই তাঁর বিদ্যালাভের পথে সব প্রতিকূলতা অন্তর্হিত হলো। শিষ্যত্বের প্রেরণায় আরুণি উদ্দাম জলস্রোতের উপর শুয়েছিলেন এবং উদ্দালক অনাহারে অন্ধপ্রায় হয়ে

কূপের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। অকুণ্ঠ শিষ্যভাব জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। উপনিষদে আছে, গুরুর আদেশে শিষ্য বনে গাভী চরাতে লাগলেন। এরূপে দীর্ঘ কাল অতীত হলে যখন শিষ্যের মধ্যে যথার্থ শিষ্যত্ব প্রকটিত হলো তখন তাঁকে অরণ্য, পর্বত, আকাশাদি সমগ্র পৃথিবী জ্ঞানদানে উন্মুখ হলো। অর্জুন যখন শিষ্যভাবে আরূঢ় হলেন তখন তাঁর কাছে জ্ঞানদ্বার উন্মুক্ত হলো।

উভয় সেনাদলের মধ্যে বিষাদকারী অর্জুনকে ভগবান উপহাস করতে করতে বললেন, "যাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তুমি তাদের জন্য শোক করছ। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিত কারো জন্য শোক করেন না। প্রিয়জনের মৃত্যু এবং জীবিত অবস্থায় তার অসদ্‌বৃত্ততা শোকের কারণ হয়। কিন্তু ভীষ্ম-দ্রোণাদি জীবিত অবস্থায় সদ্‌বৃত্ত এবং তাঁদের মৃত্যুও নাই। কারণ, তাঁরা আত্মারূপে অমর। সুতরাং তুমি তাদের জন্য শোক করছ কেন?"

এই বলে ভগবান অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ শিক্ষা দিলেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপ বিবৃত হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে বললেন, "পূর্বে আমি ছিলাম না, বা তুমি ছিলে না বা এই রাজারাও ছিলেন না—একথা সত্য নয়। কারণ জন্মের পূর্বেও আমরা আত্মারূপে ছিলাম। বর্তমানে দেহধারণ সত্ত্বেও আমরা স্বরূপতঃ আত্মা। মৃত্যুর পরেও আমরা আত্মারূপে থাকবো। অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আমাদের আত্মার অস্তিত্ব কোনরূপে বাধিত হয় না। আত্মার স্বরূপ ত্রিকালে অবাধিত।"

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

যেমন দেহীর, আত্মার দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হয়, তাতে দেহীর কোনও পরিবর্তন হয় না, সেরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিতে, মৃত্যুতে দেহী অবিনষ্ট থাকে। মৃত্যুতে কেবল স্থূল দেহের নাশ হয়। ধীর তাতে শোক করেন না।

জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বে চিত্ত দোলায়মান হয়। মানব জীবন দ্বন্দ্বময়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত রূপাদি বিষয়ের সংযোগ ঘটলেই দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়। দ্বন্দ্বসমূহ আসে যায়, চিরস্থায়ী হয় না। যিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহনে অবিচলিত চিত্তে সমর্থ হন তিনিই আত্মার স্বরূপ জানতে পারেন। আত্মা দ্বন্দ্বাতীত। দ্বন্দ্বাতীত হলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, "দ্বন্দ্বসমূহ সহ্য কর। 'তান্ তিতিক্ষস্ব ভারত।' হে ভারত, সেগুলি অপ্রতিকারপূর্ব্বক সহ্য কর। তোমার এই জড়দেহ অনিত্য, নশ্বর। কালে ইহা নষ্ট হবেই। কিন্তু তুমি আত্মারূপে অমর, অজর, অজ। অতএব যুদ্ধ ক'রে স্বধর্ম পালনে অগ্রসর হও।"

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

যিনি এই আত্মাকে হন্তা বলে জানেন এবং যিনি একে হত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই আত্মার স্বরূপ অবগত নন।

আত্মা কখনো জাত বা মৃত হন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' শরীর নষ্ট হলেও আত্মা নষ্ট হন না। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ছয়টি জড়ধর্ম। আত্মা এই ষড়বিধ জড়ধর্মের ঊর্ধে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

মানুষ যেমন জীর্ণবাস ত্যাগ পূর্বক অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে আত্মা তেমনি জীর্ণ দেহ ছেড়ে অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।

কোন শস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করতে পারে না। পাবক একে দগ্ধ করতে পারে না, জল একে ক্লিন্ন করতে পারে না এবং বায়ু একে শুষ্ক করতে পারে না।

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী ও দুর্বিজ্ঞেয়। আত্মার স্বরূপ অবগত হলে শোক দূরে যায়, শান্তি লাভ হয়।

মানুষ দেহমাত্র নয়। স্বরূপতঃ মানুষ আত্মা। জন্ম বা মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি দেহের হয়; আত্মার নয়। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হলে মৃত্যুভয় দূর হয়, শোক চলে যায়। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে আছে, শুকদেব পরীক্ষিৎকে মৃত্যুভয় দূর করবার জন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন এবং বলছেন, "তুমি দেহ নও, তুমি আত্মা।" এই জ্ঞান দৃঢ় না হলে মৃত্যুভয় যাবে না। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিস আত্মার স্বরূপ জেনে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে শেষ জীবনে তিনি যখন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তখন তাঁর কোন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মৃত্যুর পর আপনার দেহ কি ভাবে

সৎকার করবো ?” সক্রেটিস উত্তরে বলেছিলেন, “আমার দেহের সৎকার যে ভাবে ইচ্ছা করতে পারো। কিন্তু ইহা নিশ্চিত জেনো যে, এ দেহ সক্রেটিস নয়।” জন্মের আগে আমরা ছিলাম এবং মৃত্যুর পরেও আমরা থাকবো—এ বিশ্বাস সকলের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ। মন একটু অন্তর্মুখী ও একাগ্র হলেই এই পরম সত্যের আভাস পাওয়া যায়। বারট্রাণ্ড রাসেল ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ মনীষী। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি খ্রীষ্টান বলে পূর্বজন্মে বা পরজন্মে বিশ্বাসী নন। তিনি তাঁর নয় দশ বৎসর বয়স্ক এক ছেলেকে খ্রীষ্টান ধর্মের এই তত্ত্বটি শেখাবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “মিশরের পিরামিড যখন নির্মিত হয় তখন তুমি ছিলে না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অস্তিত্ব এসেছে।” পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘বাবা,আমি তখন কি করছিলাম।’ পিতা পুত্রকে বার বার বোঝানো সত্ত্বেও বালক কিছুতেই জন্মের পূর্বে তার অনাস্তিত্ব ভাবতে পারলে না। মানুষ দেহাতিরিক্ত আত্মা। সুতরাং কিরূপে এরূপ ভাবনা সম্ভব ? দেহবুদ্ধির প্রাবল্যে আমাদের আত্মবুদ্ধি আবৃত হয়েছে।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, “হে ভারত, দেহী সর্বদা অবধ্য। সুতরাং দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়। স্বধর্মের দিকে লক্ষ্য করেও তোমার ভয় ত্যাগ করা উচিত। কারণ, ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অন্য কিছু শ্রেয়ঃ নাই। ধর্ম যুদ্ধ উন্মুক্ত স্বর্গদ্বার সদৃশ। ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণেরই ধর্ম যুদ্ধ করবার সুযোগ আসে। আর যদি ধর্ম যুদ্ধ না কর তা'হলে তুমি স্বধর্ম ও স্বকীর্তি হারিয়ে পাপভাগী হবে। আর সকলে চিরকাল তোমার অকীর্তি ঘোষণা করবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মরণাধিক। কর্ণাদি মহারথগণ মনে

করবেন, তুমি ভয় পেয়ে যুদ্ধ হতে বিরত হয়েছ। তুমি যাদের নিকট সম্মানিত ছিলে এরূপে তাদের কাছে হেয় হবে। তার চেয়ে দুঃখকর আর কি হতে পারে বলো? হে কৌন্তেয়, এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গলাভ করবে, আর বিজয়ী হলে পৃথিবীর অধিপতি হবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে দাঁড়াও। তুমি ক্ষত্রিয়, ন্যায় যুদ্ধই তোমার স্বধর্ম। লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে যুদ্ধ করলে গুরুজনাদি বধের পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। নিষ্কাম কর্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান করলে সংসৃতির মহাভয় থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

"কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। যারা সকাম কর্ম করে তারা অতি হীন। নিষ্কাম কর্মী ইহজীবনে পাপপুণ্য থেকে মুক্ত হয়। কর্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে নয়। কর্মফলের কারণ হয়ো না। আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না জন্মে। 'সমত্বং যোগ উচ্যতে।' সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবকে যোগ বলে। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।' যোগই, সমত্বই কর্মের কৌশল। অতএব হে অর্জুন, যোগস্থ হয়ে কর্ম কর।"

অর্জুন শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভাবে কথা বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, এবং কিরূপেই বা বিচরণ করেন?"

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বল্লেন, "হে পার্থ, যখন যোগী সমস্ত মনোগত বাসনা ত্যাগ করে আত্মতুষ্ট হন তখনই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। বাসনা মনেই থাকে, আত্মাতে নয়। আত্মার স্বরূপ অবগত হলে বাসনা বিধ্বস্ত হয়।" কঠোপনিষদে আছে, যখন হৃদয়স্থ কামনাসমূহ থেকে মানুষ মুক্ত হয় তখনই সে অমৃতত্বের অধিকারী হয়, ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে নিঃস্পৃহ থাকেন এবং যিনি অনাসক্ত, নির্ভয় ও ক্রোধরহিত তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তিবর্জিত এবং শুভ বা অশুভ দেখা দিলে যথাক্রমে হর্ষিত বা দুঃখিত হন না, তাঁর প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠিত। ভয় পেলে কূর্ম যেমন মাথা ও হাতপাগুলি সংকুচিত করে, তেমনি যিনি শব্দাদি বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহৃত রাখেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।

বিষয়ভোগে আতুর অসমর্থ ও তপস্বী পরাঙ্মুখ। কিন্তু উভয়েরই বিষয়তৃষ্ণা থাকে। আত্মার স্বরূপ না জানলে বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটিত হয় না। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ যত্নশীল মেধাবী পণ্ডিতের মনকেও জোর করে বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত, তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।

বিষয় ধ্যান করতে করতে তাতে মানুষের আসক্তি জন্মে। আসক্তি থেকে কাম হয়। কাম প্রতিহত হলে ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ থেকে মোহ আসে। মোহ এলে মানুষ শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ ভুলে যায়। এই বিস্মৃতির ফলে তার বিবেক নষ্ট হয়। বিবেকহীন হলে মানুষ পরমার্থের অযোগ্য হয়, পশুতুল্য হয়।

বায়ু যেমন জলস্থ নৌকাকে উন্মার্গগামী করে মন সেরূপ বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়কে অনুসরণ করে। বিষয়তৃষ্ণ ব্যক্তি শান্তিলাভ করতে পারে না। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিই প্রকৃত সুখ এবং বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূলীভূত কারণ। সুতরাং যাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় থেকে একেবারে নিবৃত্ত, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। বিষয়তৃষ্ণের কাছে আত্মার স্বরূপ আবৃত থাকে। যেমন বারিরাশি আপূর্য্যমান সমুদ্রে প্রবেশ করলেও সমুদ্র স্ফীত হয় না, বা বেলাভূমি অতিক্রম করে না সেরূপ

কামনা যাঁকে বিচলিত করতে পারে না তিনিই শান্তিলাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা করেন তাঁর পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ তিনটী শ্লোকে ভগবান পরা শান্তি লাভের উপায় অর্জ্জুনকে বলেছেন। যিনি নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও নির্মল তিনি পরা শান্তির অধিকারী হন। আত্মস্বরূপ অবগতির ফলে পরা শান্তি লাভ হয়। পরা শান্তি লাভ হলে স্থিতপ্রজ্ঞ ইহজীবনে ব্রাহ্মী[১] স্থিতি ও মরণান্তে ব্রহ্মনির্বাণ[২] প্রাপ্ত হন। ইহাই মানব জীবনের পরাকাষ্ঠা, পরাগতি বা চরম উৎকর্ষ।

---

১ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি

২ ব্রহ্মে লয়।

সাত

কর্মযোগ

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হে জনার্দন, যদি আপনার মতে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ তবে আমাকে ঘোর যুদ্ধে নিযুক্ত করছেন কেন? মনে হচ্ছে, সন্দেহজনক রূপে প্রতীয়মান বাক্য দ্বারা আপনি আমার মনকে ভ্রান্ত কচ্ছেন। উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় করে বলুন যার দ্বারা আমি শ্রেয়ো লাভ করতে পারি।"

শ্রীভগবান বল্লেন, "হে অনঘ, জ্ঞানের অধিকারিগণের জন্য জ্ঞান-যোগ এবং নিষ্কাম কর্মীদের জন্য কর্মযোগ আমি বেদমুখে বলেছি। নিষ্কাম কর্ম না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভে সমর্থ হয় না। নিঃস্বার্থ সেবা, পরোপকার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে লোকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ হতে পারে।" বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।" বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও স্বেচ্ছা ভোজন-ত্যাগরূপ তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণগণের বিবিদিষা[১] লাভ হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হলে শুধু কর্মত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্ম্য[২] প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।' কর্ম না করে কেউই ক্ষণকাল থাকতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের প্রভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। যে মূঢ় হস্তপদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করে শব্দরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থ মনে মনে স্মরণ করে, সে মিথ্যাচারী, সে ভণ্ড। আর যিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহায়ে সংযত রেখে কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন তিনি পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

---

১ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা। ২ নিষ্ক্রিয় ভাব, আত্মস্বরূপে স্থিতি।

"হে অর্জুন, 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।' তুমি শাস্ত্রোক্ত কর্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হলে তোমার শরীরযাত্রাও চল্‌বে না। ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম কর্মীকে বদ্ধ করে। অতএব তুমি ভগবৎপ্রীতির জন্য অনাসক্ত হয়ে বর্ণগত ও আশ্রমোচিত কর্ম কর।"

আমরা প্রত্যহ যে অন্ন ভোজন করি তা ঈশ্বরে নিবেদন করা উচিত। যিনি ঈশ্বরে নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন, সর্বকলুষ থেকে তিনি মুক্ত হন। যে পাপাচারী তা না করে, সে পাপান্ন ভোজন করে। গীতার টীকাকার আনন্দগিরি বলেছেন, "ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নরযজ্ঞ, ও দেবযজ্ঞ—এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। উদূখল, উদকুম্ভী, পেষণী, চুল্লী ও মার্জনী দ্বারা যে পাঁচ রকম পাপ হয় তা দূর করবার জন্য এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত। যিনি এই বেদোক্ত কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেন তাঁর জীবনধারণ বৃথা।

কিন্তু যে মানুষ আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মসন্তুষ্ট তাঁর কোন কর্তব্য নেই। কর্ম না করলেও তাঁর প্রত্যবায় হয় না। ব্রহ্মা থেকে স্তম্ব পর্যন্ত কোন প্রাণীতে তাঁর প্রয়োজন-সম্বন্ধ নেই।

তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্যাং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরম্ আপ্নোতি পুরুষঃ॥১৯

শ্রীভগবান বলছেন, "হে অর্জুন, অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান কর। নিষ্কাম হয়ে কর্ম করলে নিশ্চয়ই মানুষ মুক্ত হয়।

জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি রাজর্ষিগণ নিষ্কাম কর্ম করেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'কর্মযোগ' নামক যে পুস্তক লিখেছেন সেটী অনেকের মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। গীতোক্ত শিক্ষার অনুগামী

হয়ে স্বামিজী বলতেন, কর্মযোগ অন্য-নিরপেক্ষ মুক্তিমার্গ। নিষ্কাম কর্ম বা সপ্রেম সেবাও এক প্রকার ঈশ্বরোপাসনা। সচন্দন পুষ্পগুলি ঈশ্বরচরণে অর্পণ করলে যেমন পূজা হয় তেমনি স্বীয় কর্তব্য নিষ্কামভাবে করলে ঈশ্বরের আরাধনা হয়। তাই স্বামীজী কর্মচঞ্চল বর্তমান যুগে নারায়ণ জ্ঞানে নরসেবা যুগধর্ম রূপে প্রবর্তন করলেন। চৈনিক ঋষি লাউৎজে প্রাচীন চীনে এই নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর উপদেশাবলী 'তাও-তে-কিং' নামক চীনা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। তিনি তাতে বলেছেন, "অনাসক্ত মানবই জগতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও পরম শান্তি উপভোগ করতে পারেন। তিনি সংসারে থেকেও সংসারের অতীত হন। পদ্মপত্রস্থ জলের মত তিনি সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন।"

প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী আলডাশ হাক্সলি তাঁর একখানি গ্রন্থে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত আদর্শ মানবের বহু সংজ্ঞায় ত্রুটি দেখিয়ে বলেছেন যে, গীতোক্ত অনাসক্ত মানবই আদর্শ পুরুষ। যিনি যত অনাসক্ত তিনি তত অন্তর্মুখ ও ধর্মজীবনে সমুন্নত। ফরাসী দেশের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ক্লেম্যান্সো বলেছিলেন, "গীতোক্ত কর্মযোগ যদি আমার জানা থাকতো তাহলে আমি কর্মজীবনকে সহজে ধর্মজীবনে পরিণত করতে পারতাম।" একবার ইংলণ্ডের সাল্‌ভেসন আর্মির (মুক্তি ফৌজের) প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল বুথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। মহারাণী জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ত সারা জীবন লোকসেবা, লোকোদ্ধার করে কাটিয়েছেন। আপনার অভিজ্ঞতা কি সংক্ষেপে বলুন।" বুথ ভিক্টোরিয়াকে বল্লেন, "Saved to save ; অপরকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই উদ্ধার লাভ করেছি।" উক্ত বুথ-বাণীর মর্ম এই যে, অন্যের কল্যাণ করলে নিজেরই

কল্যাণ হয়। খ্রীষ্টান সাধক ব্রাদার লরেন্স নিষ্কাম ভাবে পাচকের কর্ম করেই সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। মহাভারতে আছে, কোন ব্যাধ মাংস-বিক্রয়রূপ স্বীয় বর্ণোচিত কর্তব্য অনাসক্ত ভাবে পালন করেই আত্মজ্ঞ হয়েছিলেন। উক্ত মহাকাব্যের আর এক স্থানে আছে, অনাসক্ত পতিসেবার দ্বারাই কোন সতী সাধ্বী পত্নীর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল। সুতরাং অনাসক্ত ভাবে স্বধর্মপালনই মানবের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

মুক্ত পুরুষেরাও অপরকে অসৎপথ থেকে নিবৃত্ত এবং সৎপথে ও স্বধর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য নিষ্কাম কর্ম করেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে আচরণ করেন সাধারণ লোকেও তা অনুসরণ করে। স্বর্গ-মর্তাদি তিন লোকে অবতার পুরুষের কোন কর্তব্য নেই। তথাপি তাঁরা লোককল্যাণের জন্য সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত থাকেন, কখনো কর্ম ত্যাগ করেন না। যদি তাঁরা অতন্দ্রিত ভাবে কর্মরত না থাকতেন, সাধারণ মানুষেরা তাঁদের অবলম্বিত পথেরই অনুবর্তী হয়ে কর্মত্যাগ করতো। আলস্য হেতু কর্তব্যপালন না করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কর্ম করা কিরূপে সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দিয়েছেন। মূঢ়গণ আসক্ত হয়ে যেরকম কর্ম করেন জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হয়ে সেরূপ কর্ম করেন। তাই শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরাবতারগণ অবহিত চিত্তে কর্ম করে অজ্ঞানীদিগকে স্বকর্মে, স্বধর্মে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তবে তাঁরা কর্তৃত্বের অভিমান ছেড়ে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করতেন।

ভগবান অর্জুনকে তাই বললেন, ঈশ্বরের জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করছি —এই বুদ্ধিতে আমাতে সকল কর্ম সমর্পণপূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে মমত্বহীন ও শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ কর। যাঁরা শ্রদ্ধাহীন হয়ে গীতোক্ত কর্মযোগের নিন্দা করেন তাঁরা স্বধর্মভ্রষ্ট হন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫

স্বধর্মের অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বর্ণাশ্রমবিহিত স্বধর্ম পালনে নিধনও শ্রেয়স্কর। কিন্তু অন্যের বর্ণাশ্রমোচিত[১] ধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টকর।

অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং যেন বলপূর্বক নিযুক্ত হয়ে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়?" শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "রজোগুণজাত কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ স্বধর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ করে। যেমন ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে তেমনি দুষ্পূরণীয় বিষয়-তৃষ্ণারূপ কামের দ্বারা মানুষের বিবেক সমাচ্ছন্ন থাকে।" মহাভারতে আছে, রাজা যযাতি স্বীয় যৌবন এবং স্বপুত্র পুরুর যৌবন দীর্ঘ কাল ভোগ করেও তৃপ্ত হন নি। তাই শেষে তিনি বলেছিলেন—

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥

কামীদিগের কাম কখনো উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না। অগ্নিতে

১ বর্ণ চারিটী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র।
১ আশ্রম চারিটী—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

ঘৃতাহুতি দিলে উহা যেরূপ বর্ধিত হয়, তেমনি উপভোগের দ্বারা বাসনার বৃদ্ধিই হয়, হ্রাস হয় না।

এই কাম সাধকের চিরশত্রু এবং অনলের ন্যায় দুষ্পূরণীয়। বিষয়-তৃষ্ণাকে কাম বলে। কাম প্রতিহত হলে ক্রোধে পরিণত হয়। তাই কাম ও ক্রোধ বিষয়তৃষ্ণার দুটী বৃহৎ রূপ। তপস্যারত মহাদেবকে কাম এসে প্রলুব্ধ করেছিলেন। তখন শিব ঠাকুর ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রোধাগ্নিতে কামদেবকে ভস্মীভূত করেন। সেদিন থেকে কামদেব অনঙ্গ হয়ে যান এবং মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে বাস করতে থাকেন। কামই বিবেককে আবৃত করে, মানুষকে বিপথগামী ও স্বধর্মত্যাগী করে। দুর্জয় কামের মূলোচ্ছেদ করতে হলে আত্মস্বরূপে আরূঢ় হওয়া দরকার। কামের আশ্রয় দেহেন্দ্রিয়াদি হতে আত্মা পৃথক্—এই জ্ঞান যতই দৃঢ় হবে ততই কামের প্রভাব কমে যাবে। কারণ দেহবুদ্ধিই কামের মূল। দেহবুদ্ধি যত ক্ষীণ হবে কাম তত নিস্তেজ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, "সকালে ও সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে উচ্চ স্বরে হরিনাম করলে কামের বেগ দূর হয়।" গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে আছে।—

> শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
> কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩

দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত যিনি কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করতে পারেন তিনিই যোগী, তিনিই সুখী।

কাম ক্রোধাদি রিপু দেহাসক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আসক্তি চলে গেলেই ষড়রিপু সমূলে বিনষ্ট হয়। আসক্তি ষড়রিপুর মূল। বিষয়-চিন্তা থেকে আসক্তি জন্মে। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ কত

প্রবল, আসক্তি কত দৃঢ়মূল এবং অনাসক্তি কত দুর্লভ তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর অনুরক্ত শিষ্য ও সেবক আনন্দের সঙ্গে একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে একস্থানে বুদ্ধদেব আনন্দকে বল্লেন, "আনন্দ! আমি আর এগুতে পাচ্ছি না। এখানে কে যেন আমায় টান্‌ছে।" আনন্দ তথায় ভাল রূপে নিরীক্ষণ করলেন; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তথাগত যে দিক থেকে টান অনুভব করছিলেন সে দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, মাটীর ভেতর কি একটা একটু দেখা যাচ্ছে এবং চক্‌চক কচ্ছে। তাঁর নির্দেশে আনন্দ নিজ হাতের লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখলেন, সেটা বুদ্ধদেবের পূর্ব-ব্যবহৃত সোনার বালা। সন্ন্যাসী হবার সময় সেটী তথায় বুদ্ধদেব ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং বস্তুর সন্নিহিত হতেই ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট হচ্ছে। আনন্দ বল্‌লেন, "ভগবান্, এটী মূল্যবান্ দ্রব্য, পূত স্মৃতিতে জড়িত। এটী নিয়ে যাই। কোনো বিহারে সযত্নে রাখবো।" ভগবান্ বল্লেন, "আনন্দ, এটা এখনি দূরে ফেলে দাও। যেমন পরিত্যক্ত নিষ্ঠীবন আর মুখে দিতে নেই তেমনি পরিত্যক্ত বস্তুও আর গ্রহণ করা উচিত নয়।" ভগবানের আদেশে আনন্দ সেটী শূন্যে সজোরে ছুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু সেটি আবার ফিরে এসে আনন্দের হাতে পড়লো। তা দেখে বুদ্ধদেব বল্‌লেন, "আনন্দ, তুমি আসক্তির সূতোয় এটি বেঁধে রেখেছ বলে এটী দূরে গেল না। আসক্তির সূতো কেটে এটী ছুঁড়ে ফেলে দাও।" আনন্দ ভগবানের আদেশ পালন করলেন। তখন সোনার বালা আর আনন্দের হাতে ফিরে এলো না।

আট

ঈশ্বরের অবতার

শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "হে পরন্তপ, ইতঃপূর্বে যে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করেছি তা আমি সূর্য্যকে বলেছিলাম। সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে এবং মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই কর্ম্মযোগ ক্ষত্রিয়পরম্পরায় সমাগত। রাজর্ষিগণ এই কর্মরহস্য জানতেন।"

অর্জুন বল্‌লেন, "হে ভগবান, আপনার জন্ম অনেক পরে এবং সূর্য্যের জন্ম বহু পূর্বে হয়েছিল। আপনি পূর্বে সূর্য্যকে এই যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন তা কিরূপে জানবো?" শ্রীভগবান বল্‌লেন, "হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সে সকল জানি; কিন্তু তুমি সে সব ভুলে গেছ। কারণ তুমি মায়াধীন, আর আমি মায়াধীশ। আমি অজ, আমার জ্ঞানশক্তি মানবদেহ ধারণ-কালেও অলুপ্ত থাকে এবং ব্রহ্মা হতে স্তম্ব পর্য্যন্ত আমি সর্বভূতের ঈশ্বর। আমি স্বীয় মায়া আশ্রয় করে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, দেহ ধারণ করি। কিন্তু আমার জন্ম জীবের ন্যায় বাস্তব নয়, মায়িক। আমার দিব্য স্বরূপ আজন্ম অনাবৃত আছে।

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি, দেহ ধারণ করি।"

শঙ্করাচার্য্য তাঁর গীতা-ভাষ্যে বলেছেন, "ভগবানের স্বভাব নিত্য শুদ্ধ

বুদ্ধ মুক্ত। স্বপ্রয়োজনের অভাবসত্ত্বেও অজ ঈশ্বর মায়িক দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি যেন দেহবান্ হন, যেন জাত হন। কারণ, তাঁর দেহধারণ মায়িক, তিনি মায়া-মনুষ্য।"

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

সাধুগণের পরিত্রাণার্থ, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং বর্ণাশ্রম-ধর্মের সংস্থাপননিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের দশাবতারের কথা আছে। বাংলার অমর কবি জয়দেব দশাবতারের যে অপূর্ব স্তোত্র রচনা করেছেন তা সমগ্র ভারতে অসংখ্য নরনারী আবৃত্তি করেন। শাস্ত্রে আছে—

মৎস্যকূর্মবরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কিঃ চ তে দশঃ ॥

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ও কল্কি—ভগবানের এই দশ অবতার।

মৎস্যাবতার থেকে বুদ্ধাবতার পর্যান্ত অবতারত্বের ক্রমবিকাশ দেখা যায়। মানুষের কাছে ভগবান মানুষরূপেই আসেন, অন্য জীবের কাছে তাদেরই রূপ ধরে আসেন। ভারতের মত অন্য কোন দেশে এত অবতার হয় নি। প্রত্যেক ধর্মে এক একটি অবতার পূজিত হন। খ্রীষ্টানগণ জীশু খ্রীষ্টকে, মুসলমানগণ মহম্মদকে, পারসীগণ জোরোয়াস্তারকে, তাওবাদিগণ লাউৎজেকে এবং ইহুদীগণ মুসাকে অবতার বলে পূজা করেন। অবশ্য অবতারের ধারণা প্রত্যেক ধর্মে বিভিন্ন। প্রত্যেক ধর্মে এক একটি অবতারের কথা থাকলেও হিন্দু ধর্মে বহু অবতার আছেন। গীতার উদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট করে

বলছেন, " 'ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' ধর্মস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হই।"

আমাদের দেশে শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুগণ অবতাররূপে আরাধিত। অবতারের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মে যিনি পূর্ণ বিশ্বাসী দেহান্তে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "অবতারে বিশ্বাস পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ।" দুষ্টের দমন অবতার কর্তৃক সাধিত হয়। দুষ্টের নিগ্রহে তাঁর নির্দয়তা শঙ্কা করা উচিত নয়। সন্তানের শাসনে মাতার যেমন সন্তানের প্রতি অকারুণ্য হয় না, সেরূপ দুষ্টদের দমনে গুণ ও দোষের নিয়ন্তা ভগবানেরও তাদের প্রতি অকারুণ্য হয় না।

যিনি যেভাবে অবতারের উপাসনা করেন তিনি সেভাবে অবতার কর্তৃক অনুগৃহীত হন। অবতার কর্তৃক প্রদর্শিত পথে ব্যক্তি ও সমাজ ধর্মপথে চালিত হয়। ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করলেও ভগবানের উপাসনা করা হয়। কারণ ঐশী শক্তি সর্বদেবে প্রকাশিত। ভাগবতে আছে, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। অবতার ঈশ্বরের মানব-মূর্তি।

অবতারে ঈশ্বরত্ব সদা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই তিনি কল্যাণকর কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত থাকলেও কর্মে লিপ্ত হন না; কর্মফলে তাঁর স্পৃহা নেই। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা তাঁর না থাকায় তিনি কর্মে কখনো বদ্ধ হন না। অবতারগণ যেরূপে নিষ্কাম কর্ম করেছেন সেরূপে নিষ্কাম কর্ম করাই মানব-জীবনের আদর্শ। সনাতন ধর্মকে যুগোপযোগী করে অবতার প্রচার করেন। যুগধর্মের পূর্ণ প্রকাশ অবতারের জীবনে দেখা যায়। তাই অবতার আমাদের আদর্শ।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥১৮

যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে জ্ঞানী ও যোগী ও সর্বকর্মের অনাসক্ত কর্তা।

যাঁর সমস্ত কর্মচেষ্টা কামনাশূন্য ও সংকল্পবর্জিত এবং যাঁর শুভাশুভ কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে তাঁকে বুধগণ পণ্ডিত বলে থাকেন। যিনি কর্মফলে আসক্তি ছেড়ে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন, কর্মে প্রবৃত্ত হলেও তিনি কিছুই করেন না। আত্মার নৈষ্কর্ম্য দর্শনহেতু জনকাদির ন্যায় তিনি কর্তৃত্বে বা ভোক্তৃত্বে নির্লিপ্ত থাকেন। মরীচিকায় জল এবং শুক্তিকাতে রজত ভ্রমের ন্যায় নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব দর্শন ভ্রান্ত জীবের স্বভাব। নৌকারূঢ় ব্যক্তি নৌকা চলতে থাকলে তটস্থ গতিহীন বৃক্ষসমূহে প্রতিকূল গতি এবং দূরস্থ গতিশীল বস্তুকে গতিহীন দেখেন। এরূপ বিপরীত দর্শন অজ্ঞানের ধর্ম। যাঁর অজ্ঞানাবরণ ছিন্ন হয়েছে তাঁর এরূপ বিপরীত দর্শন হয় না। 'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ।' যেটা যা নয় তাকে সেভাবে দেখাই অজ্ঞানীর স্বভাব। কিন্তু অজ্ঞান তিরোহিত হলে মিথ্যা জ্ঞান হয় না, সত্য জ্ঞান হয়। অবতারে এই সত্য জ্ঞান, যথার্থ দর্শন আজন্ম অব্যাহত থাকে।

যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত, বিমৎসর[১], যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদর্শী, তিনি জ্ঞানী। শরীর ধারণের উপযোগী কর্ম করলেও তিনি কর্মে বদ্ধ হন না। জ্ঞানই নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি ও যোগের চরম লক্ষ্য। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও গুরুসেবা দ্বারা সেই পরমার্থ জ্ঞান তত্ত্বদর্শীর কাছে লাভ করতে হয়। সেই জ্ঞান লাভ

---

১ মাৎসর্য্যহীন।

করলে মানুষ আর কখনো মোহগ্রস্ত হয় না। একবার পরা জ্ঞান হলে পুনরায় অজ্ঞান আসে না। উক্ত জ্ঞান লাভ করলে ব্রহ্মদর্শন হয়। সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জলযান সহায়ে ধর্মাধর্মরূপ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে সেরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল শুভাশুভ কর্ম ভস্মসাৎ করে।

কর্ম তিন প্রকার—সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারব্ধ[১]। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে তাদের সংস্কার মনে সঞ্চিত আছে। সেগুলি সঞ্চিত কর্ম। সে সকল জ্ঞানাগ্নিতে বিদগ্ধ হয়। ক্রিয়মান কর্ম জ্ঞানলাভের পর ফলপ্রসব করতে পারে না। যে সঞ্চিত কর্ম ফলপ্রসব করতে আরম্ভ করেছে এবং যার ফলে শরীর উৎপন্ন হয়েছে তাকে প্রারব্ধ কর্ম বলে। প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানাগ্নিতে বিনষ্ট হয় না, ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়। সেজন্য জ্ঞানীও প্রারব্ধের অধীন।

যোদ্ধার তূণে যে তারগুলি থাকে সেগুলিকে সঞ্চিত কর্মের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়। সেগুলি অব্যবহৃত থাকায় ফলপ্রসবে অক্ষম। কিন্তু যে তীরটি ধনুক ছেড়ে চলে গেছে সেটি লক্ষ্যভেদ করবেই, ফলপ্রসূ হবেই। সেটি ভুজ্যমান প্রারব্ধ কর্মসদৃশ। প্রারব্ধ ভোগ করলেও জ্ঞানী কখনো মূঢ় হন না। যে তীরটি ধনুকে সংযোজিত করবার জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে সেটিকে ইচ্ছা করলে আমরা ফেলে দিতে পারি। ক্রিয়মান কর্মও তেমনি। সেটি করা না করা আমাদের ইচ্ছাধীন।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান তুল্য পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে আর কিছু নেই। গুরুবাক্যে ও বেদান্তে বিশ্বাসী, শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয়,

১ প্র (প্রকৃষ্টরূপে) + আরব্ধ (ফলপ্রসূ)।

মুমুক্ষু অবশ্যই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি জ্ঞান লাভান্তে জন্মান্তর গ্রহণ বা লোকান্তর গমন না করে শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হন। এই ব্রহ্মজ্ঞান অবতারে আজন্ম সুপ্রকট থাকে। শাস্ত্রে আছে, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মা, মূঢ় ব্যক্তি পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। তার ইহলোকেও সুখ নেই, পরলোকেও শান্তি নেই। কিন্তু জ্ঞানী সদা সংশয়মুক্ত। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুতে যাঁর ব্রহ্মদর্শন হয় তাঁর হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন, সকল সংশয় ছিন্ন এবং সর্বকর্ম ক্ষীণ হয়।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে, বিদ্যা দুই প্রকার—অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। 'পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে।' যার দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্ম অধিগত হন সেটী পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যার নামান্তর ব্রহ্মবিদ্যা। গীতায় ব্রহ্মবিদ্যাই উপদিষ্ট। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হওয়াই হিন্দু জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

———

নয়

প্রকৃত সন্ন্যাসী

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কৃষ্ণ, আপনি কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ের প্রশংসা করছেন। এ দুটির মধ্যে যেটি উৎকৃষ্টতর সেটি সুনিশ্চিত করে আমাকে বলুন।" উত্তরে শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বললেন, "কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিদায়ক। কিন্তু তাদের মধ্যে জ্ঞানহীন কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর। কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানের পরিপাকের জন্য জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গরূপে কর্মসন্ন্যাস কর্তব্য। অজ্ঞানীর পক্ষে কর্মযোগ সহজ বলে শ্রেষ্ঠ।"

যিনি দুঃখকে দ্বেষ করেন না, বা সুখের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। কারণ, রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হওয়ায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হন না। প্রকৃত সন্ন্যাসী শুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্বভূতের আত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে দেখেন। তিনি স্বাভাবিক্ বা লোককল্যাণার্থ কর্ম করলেও উহাতে বদ্ধ হন না। তিনি দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, কথনে, মলমূত্রাদি ত্যাগে, গ্রহণে, চক্ষুর উন্মেষে, ও নিমেষে অনুভব করেন—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং আমি অকর্তা আত্মা।

যিনি নিষ্কাম, অনাসক্ত ও সর্বকর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে সিক্ত করতে পারে না তেমনি পাপপুণ্য তাঁকে স্পর্শ করতে

পারে না। প্রকৃত সন্ন্যাসী কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। তাঁর এই ধারণা সর্বদা সুদৃঢ় থাকে যে, আমি ঈশ্বরার্থ কর্ম করছি, ফল লাভার্থ নয়। নিষ্কাম মনোভাবের ফলে তিনি পরমা শান্তির অধিকারী হন। কিন্তু সকাম কর্মী কর্মফলে আসক্ত থাকায় সংসারে আবদ্ধ হন। প্রকৃত সন্ন্যাসী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য বা নিষিদ্ধ কোন কর্মে লিপ্ত হন না। তিনি নিরায়াস, নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয় হয়ে নবদ্বার দেহপুরে অবস্থান করেন।

কর্ম চার প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ। সন্ধ্যা-বন্দনাদি অবশ্যকর্তব্য দৈনিক কর্ম নিত্য কর্ম। গৃহদাহাদি নিমিত্তবশতঃ যাগযজ্ঞ প্রভৃতি যে সকল বিশেষ কর্ম করতে হয় সেগুলি নৈমিত্তিক। স্বর্গাদি ফললাভের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞাদি যে কর্ম করা হয় তাকে কাম্য কর্ম বলে। নরহত্যাদি গর্হিত কর্ম নিষিদ্ধ কর্ম। এই চার প্রকার কর্মে প্রকৃত সন্ন্যাসী নিঃস্পৃহ। কারণ তিনি আত্মস্বরূপে সদা আরূঢ় থাকেন। আত্মাতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি উপাধি নেই। নীলিমাশূন্য আকাশে যেমন নীলিমা ভ্রম হয় মাত্র, সেরূপ আত্মাতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণ আরোপিত হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসী সেই ভ্রম হতে চির-মুক্ত।

সূর্য্যের উদয়মাত্র যেমন অন্ধকার অপসৃত হয় তেমনি আত্মজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং 'আত্মাই ব্রহ্ম' এই উপলব্ধি জন্মে। আত্মজ্ঞানীর আর পুনর্জন্ম হয় না। তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন।

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮

বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণে এবং গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে ব্রহ্মজ্ঞগণ সমদর্শী হন।

সূর্য যেমন গঙ্গাজলে ও সুরাতে প্রতিবিম্বিত হলে গঙ্গাজলের গুণে বা সুরার দোষে লিপ্ত হন না, সেরূপ ব্রহ্ম শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বস্তুতে অবস্থিত হলেও শুদ্ধি বা অশুদ্ধি তাঁকে স্পর্শ করে না। যিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থিত এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে অলিপ্ত থাকেন তাঁকে দোষ-গন্ধও স্পর্শ করতে পারে না।

> ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
> স্থিরবুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০

ব্রহ্মবিৎ সদা ব্রহ্মে আরূঢ় থাকেন। ব্রহ্মে তাঁর আত্মবুদ্ধি সুস্থির। তিনি সর্বপ্রকারে মোহশূন্য। তিনি প্রিয় বস্তু পেলে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয় বস্তু পেলে উদ্বিগ্ন হন না। তিনি সদা অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ব্রহ্মজ্ঞান হলে প্রতি লোমকূপে কোটি রমণ-সুখ অনুভূত হয়।" ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণিক। তাই জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সুখের প্রয়াসী নন। প্রকৃত সন্ন্যাসী অন্তঃসুখ, অন্তরারাম, অন্তর্জ্যোতি, ব্রহ্মভূত ও জীবন্মুক্ত। তাঁর জীবনে ও মরণে ব্রহ্মনির্বাণ বিরাজ করে।

———

দশ

ধ্যানের বিধি

পূর্ব অধ্যায়ে প্রকৃত সন্ন্যাসীর লক্ষণ বলা হয়েছে। গীতার মতে যিনি নিরগ্নি বা নিষ্ক্রিয় তিনি সন্ন্যাসী নন। কিন্তু যিনি কর্মফলের আশ্রিত না হয়ে কর্তব্য কর্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি সংন্যস্ত-সংকল্প তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সংকল্প-সন্ন্যাসীকে যোগারূঢ় বলে। মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে।—

কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি॥

হে কাম, তোমার মূল আমি জানি। সংকল্প থেকে তোমার জন্ম। তোমাকে আর সংকল্প করবো না। তাহলে তুমি সমূলে বিনষ্ট হবে।

অসৎ সংকল্প মনে স্থান দিতে নেই। অসৎ সংকল্প থেকেই অসৎ কামনা জন্মে। অসৎ সংকল্পকে প্রশ্রয় দিয়েই আমরা ধ্বংসমুখে ধাবিত হই। আমরা ইচ্ছা করলে অসৎ সংকল্প মনে আসতে নাও দিতে পারি এবং শুভ সংকল্প মনে স্থান দিতে পারি। যিনি অসৎ সংকল্পকে মনে স্থান দেন তিনি নিজেই নিজের শত্রু। আবার যিনি শুভ অন্তরে সংকল্প পোষণ করেন তিনি নিজেই নিজের বন্ধু। শুভ সংকল্পকে মনে স্থান দিলে মানুষ নিজেই নিজের উদ্ধারক, পরিত্রাতা হয়। শুভ সংকল্প দ্বারা মন স্বর্গে এবং অশুভসংকল্প দ্বারা মন নরকে পরিণত হয়। ইংরাজ মহাকবি মিল্টন সত্যই বলেছেন, মনই স্বর্গকে নরকে এবং নরককে স্বর্গে পরিণত করতে পারে।

যিনি যোগারূঢ়, জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুখে দুঃখে নির্বিকার হন, তিনি মাটি, পাথর ও সোণায় সমদর্শী। সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও পাপীতে যোগারূঢ় সমবুদ্ধি করেন। মনের সমত্বকে যোগ বলে। সেই যোগসাধনের উপায় ও ধ্যানবিধি গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "নির্জন স্থানে নিঃসঙ্গ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও অপরিগ্রহ হয়ে, দেহ-মনকে সংযত করে ধ্যানাভ্যাস করতে হয়। স্বভাবতঃ বা সংস্কারতঃ শুদ্ধ স্থানে প্রথমে কুশ, তদুপরি যথাক্রমে মৃগচর্ম ও বস্ত্র দিয়ে আসন রচনা করতে হয়। আসন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন হওয়া উচিত নয়। সেই আসনে বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য সংযত করে একাগ্র মনে ইষ্টদেবতার ধ্যান করতে হয়।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ।" শুদ্ধস্থানে শাস্ত্রপাঠ ও জপ-ধ্যানাদি করা বিধেয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, "যে স্থান শুচি ও বহ্নিবালুকাবর্জিত, যেখানে সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয় বা সভামণ্ডপ বা প্রবল বায়ুপ্রবাহ নেই, যাহা মনের অনুকূল ও চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, সেই স্থান ধ্যানের উপযুক্ত। এজন্য গুহাদি স্থান ধ্যানের পক্ষে প্রশস্ত। ভগবান বুদ্ধ নিরঞ্জনা নদীতটে বোধিদ্রুমতলে ধ্যানে বসবার পূর্বে এই সুদৃঢ় সংকল্প করেছিলেন।—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হোক্; ত্বক্, অস্থি, মাংস ধ্বংস হোক্। বহু কল্পে দুষ্প্রাপ্য বোধি লাভ না করে আমি এই আসন ছাড়বো না। এরূপ অটল সংকল্প নিয়ে প্রত্যহ ধ্যানে বস্তে হয়।

পীঠ, ঘাড় ও মাথা সরল ও নিশ্চল রেখে, স্থির হয়ে বসে, কোন দিকে না তাকিয়ে নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করতে বলার উদ্দেশ্য চক্ষুর অবস্থান নির্দেশ, নাসাগ্র দেখার বিধি নয়। কারণ নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির হলে মন নাসাগ্রেই স্থির হবে। কিন্তু ধ্যানের উদ্দেশ্য অন্তর্দেবতায় মন স্থির করা, নাসাগ্রে নয়। যাঁর চিত্ত প্রশান্ত ও নির্ভয়, যিনি ব্রহ্মচর্য পালন ও গুরুসেবাদি ব্রতে অটল, যিনি নিত্য ঈশ্বরচিন্তা করেন, তিনিই ধ্যানাভ্যাসের সুযোগ্য অধিকারী। ধ্যানের ফল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত।—

লঘুত্বম্ আরোগ্যম্ অলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষম্ অল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥

ধ্যানাভ্যাসের বা যোগসাধনের ফলে দেহের লঘুতা ও রোগরাহিত্য, নির্লোভতা ও দেহবর্ণের উজ্জ্বলতা, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা, গাত্রগন্ধের শুভতা এবং মল ও মূত্রের অল্পতা হয়।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥

ধ্যানাভ্যাসের ফলে ব্রহ্মের অভিব্যক্তিসূচক তুষার, ধূম, সূর্য্য, অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্রের ন্যায় রূপসমূহ অগ্রে দৃষ্ট হয়।

অল্পাহারী না হলে শরীর হাল্‌কা থাকে না, ধ্যানে মন বসে না।

তাই আহার-কালে অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা উদরের অর্ধ ভাগ ও জলের দ্বারা উদরের এক-চতুর্থাংশ পূর্ণ করতে এবং বায়ুর সঞ্চরণার্থ বাকী চতুর্থাংশ শূন্য রাখতে হয়। অতিভোজীর, একান্ত অনাহারীর, অত্যন্ত নিদ্রালুর বা অতিশয় রাত্রি-জাগরণকারীর ধ্যান হয় না। যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং পূজা-পাঠাদি কর্মে যুক্তচেষ্ট, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ কালে ও পরিমাণে নির্দিষ্ট তাঁর ধ্যান দুঃখনাশক হয়।

ধ্যানাভ্যাসীকে বাজে চিন্তা করা বা বাজে বই পড়া একেবারে ছাড়তে হবে। ধর্মগ্রন্থ পড়া এবং ধর্মপ্রসঙ্গ বা ধর্মসঙ্গীত শোনা ধ্যানের প্রভূত সহায়ক। নির্বাত স্থানে দীপশিখা যেমন অকম্পিত থাকে তেমনি ধ্যানাসনে অবস্থিত ব্যক্তির একাগ্র মন নিশ্চল ও নিষ্কম্প হয়। ধ্যানে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হলে আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

যে পরমানন্দ লাভ করলে অন্য কোন লাভ তদপেক্ষা অধিক মনে হয় না, যাহাতে আরূঢ় হলে গুরুদুঃখেও মন বিচলিত হয় না তাহাই গভীর ধ্যানে অনুভূত হয়।

ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মন শস্ত্রনিপাতাদিজনিত দুঃসহ দুঃখেও অবিচলিত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন কালীবাড়ীর অধিকারী মথুরানাথ বিশ্বাসের বাড়ীতে ছিলেন তখন তাঁর ধ্যানমগ্নতা দেখে উক্ত বাড়ীর এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ঈর্ষান্বিত হন। ব্রাহ্মণ হিংসায় জর্জরিত হয়ে একদিন ধ্যানমগ্ন পরমহংসের দেহে এক টুকরা জ্বলন্ত কয়লা লাগিয়ে দেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ের চামড়া পুড়ে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

কিন্তু দেহবোধশূন্য ঠাকুর মোটেই তা টের পান নি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যখন তিনি ধ্যান করতেন তখন তাঁর দেহের উপর দিয়ে কখনো কখনো সাপ চলে যেত এবং জটামণ্ডিত মস্তকে পাখী বসে ঠোকরাত। কিন্তু মহাধ্যানী তা বুঝতে পারতেন না।

যোগ অষ্টাঙ্গ। তন্মধ্যে ধ্যান যোগের সপ্তম অঙ্গ। ধ্যান গভীরতম হলে সমাধি হয়। সমাধিতে সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে ভগবানের সগুণ সাকার রূপ দেখা যায়। নির্বিকল্প সমাধিতে ভগবানের নির্গুণ নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তৎশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সমাধি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু সাধারণ ধ্যানীর সমাধিলাভ হয় না। ধ্যানে তাঁদের মন এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়, ধ্যেয় বস্তুতে বসে না। তখন অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হতে তাকে নিবৃত্ত করে ধ্যেয় মূর্তিতে স্থির করতে হয়। কঠ উপনিষদে আছে, "যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় ছেড়ে মনের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট হয় তখন সেই সুস্থির ইন্দ্রিয়ধারণার নাম ধ্যান।" ধ্যানে যে বিমল শান্তি বা পরমানন্দ লাভ হয় তার সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়-সুখের তুলনা হয় না।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে মধুসূদন, আপনি যে ধ্যানের বিধি আমাকে বললেন আমার মন চঞ্চল বলে তা বুঝতে পারলাম না। হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, প্রবল এবং ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ উৎপাদক। একে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা সুকঠিন।

তাই একে নিরোধ করা আকাশস্থ বায়ুকে পাত্রবিশেষে আবদ্ধ করার ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।"

শ্রীভগবান অর্জুনকে বল্‌লেন, "হে মহাবাহো, মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, নিত্য ধ্যানাভ্যাস করলে এবং ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা এলে মন সংযত হয়। ধ্যান অসংযত ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর হলেও জিতেন্দ্রিয় ও যত্নশীল ব্যক্তি নিয়মিত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ধ্যানে ডুবে যেতে পারেন।"

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধাবান্‌ যত্নহীন ধ্যানচ্যুত ব্যক্তি দেহান্তে কোন্‌ মার্গে গমন করবেন? তিনি কি ছিন্নাভ্রের[১] ন্যায় ইহলোকে ও পরলোকে নিরাশ্রয় হবেন?" শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "হে পার্থ, কল্যাণকারীর কখনো দুর্গতি হয় না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে পতিত বা পরলোকে হীন জন্ম প্রাপ্ত হন না। তিনি পুণ্যকারীগণের প্রাপ্য ঊর্দ্ধলোকে গিয়ে তথায় বহু বৎসর বাস করেন। অনন্তর তিনি সদাচার শ্রীমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন ধীমান্‌ যোগভ্রষ্ট যোগীকুলে ভূমিষ্ঠ হন। ঈদৃশ জন্ম জগতে দুর্লভ। হে কুরুনন্দন, যোগভ্রষ্ট পুরুষ সেই দেহে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ধ্যানে সিদ্ধিলাভের জন্য অধিকতর প্রযত্ন করেন। পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ তিনি যেন অবশ হয়েও ধ্যানসাধনে প্রবৃত্ত হন। কোন জন্মের তপস্যা ব্যর্থ হয় না। তার ফল মনে সঞ্চিত থাকে এবং পরবর্তী জন্মে কার্য্যকরী হয়। বহু জন্ম ধ্যান অভ্যাস করলে ঈশ্বরদর্শন বা মুক্তিলাভ হয়।"

---

১ মেঘখণ্ড।

ধ্যানে বৃহত্তর ব্যাপক জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আয়ারল্যাণ্ডের সুকবি জর্জ রাসেল বলেছেন, ধ্যানের ফলে মানুষ সকল খণ্ডতা, ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে অসীম অনন্ত জীবনের সহিত সংযুক্ত হয়। দূর দর্শন, দূর শ্রবণ, অপরের বা নিজের রোগারোগ্য, অন্যের মনের কথা বলা প্রভৃতি শক্তি ধ্যানীর করায়ত্ত হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় সব কাজ ফেলে প্রত্যেকের ধ্যান অভ্যাস করা উচিত।

এগার

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ঈশ্বরদর্শনই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।" কিন্তু সে সৌভাগ্যের অধিকারী খুব কম লোকেই হয়। শ্রীভগবান গীতার সপ্তম অধ্যায়ে অর্জুনকে বলছেন, "সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ ঈশ্বরদর্শন বা জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হয় এবং প্রযত্নশীল মুমুক্ষুদের মধ্যেও কচিৎ কেউ আমার স্বরূপ জানতে পারে।" ভগবানকে জানলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। ঈশ্বরের দর্শন পেলে মানুষ সর্বজ্ঞ হয়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ?" হে ভগবান, কাকে জানলে এই সব জ্ঞাত হওয়া যায় ? গুরু শিষ্যকে বললেন, ব্রহ্মজ্ঞ হলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, "হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারণান্তর আর নাই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে এই দৃশ্যমান জগৎ তেমনি আমাতে বিধৃত আছে। হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস, চন্দ্রে ও সূর্যে জ্যোতি, সর্ব বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ ও মনুষ্যে পৌরুষরূপে বিরাজ করি।"

"আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন ও তপস্বিগণের মধ্যে তপঃশক্তিরূপে বিরাজিত। হে পার্থ, আমাকে স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতের কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীর তেজ। আমি বলবানের কাম-রাগ-বর্জিত বল। হে ভরতর্ষভ, আমি সর্বভূতে ধর্মসঙ্গত কামনা। প্রাণিগণের মনে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব স্বকর্মের ফলে উৎপন্ন হয়। সেগুলি

মৎসৃষ্ট বলে জানবে। সে সকল ভাব আমা থেকে উৎপন্ন হলেও আমি তাদের অধীন নয়, তারাই আমার অধীন।"

ত্রিগুণসঞ্জাত ভাবরাশির দ্বারা জগৎ মোহিত বলে অব্যয় ঈশ্বরকে জানতে আমাদের ইচ্ছা হয় না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪

আমার দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, অঘটনঘটনপটীয়সী ও দুরতিক্রম্যা। কিন্তু যারা আমার প্রপন্ন[১] হয় তারা আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে। মূঢ়গণ মায়ামুগ্ধ থাকায় ঈশ্বরচিন্তা করে না। ভগবানের শরণাগত হলে মায়ার ভুবনমোহিনী শক্তি থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে। রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বরূপে মায়া-শক্তি প্রধানতঃ প্রকাশিত।

ভগবানের ভক্ত চতুর্বিধ—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। তস্কর, রোগ ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা নিপীড়িত হয়ে মানুষ আর্ত হলে ভগবানকে ডাকে। যাদের মনে ভগবানকে জানবার ইচ্ছা জেগেছে তারা জিজ্ঞাসু। যারা ফলকামী হয়ে ঈশ্বরের ভজনা করে তারা অর্থার্থী। ভাগবতে আছে, অহঙ্কারাদি হৃদয়গন্থি হতে মুক্ত আত্মজ্ঞানী মুনিগণও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকেন। শ্রীহরির ঈদৃশী মহিমা। এই চারি প্রকার পুণ্যকর্মা ভক্তগণের মধ্যে জ্ঞানিগণই ভগবানের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। অন্য তিন প্রকার ভক্ত উদার হলেও জ্ঞানী ভগবানের প্রাণতুল্য, আত্মস্বরূপ। বহু জন্মের সাধনফলে শেষ জন্মে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। আত্মজ্ঞ মহাত্মা সুদুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ভগবানকে জানাই জ্ঞান, আর অন্য সব জানা অজ্ঞান।"

---

১ শরণাগত।

উপনিষদে আছে—পরা বিদ্যার দ্বারা অক্ষর পুরুষ বিজ্ঞাত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ভগবানকে দর্শন করাই জ্ঞান এবং তাঁর সঙ্গে আলাপাদি করা ও তাঁকে আত্মারূপে উপলব্ধি করা বিজ্ঞান।"

যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করেন সেই সেই দেবমূর্তিতে ভগবান তাঁদিগকে অচলা ভক্তি দেন। সেই সেই ভক্ত ভক্তিভরে উক্ত দেবতার আরাধনা করেন এবং জগৎপিতা পরমেশ্বরের শক্তিতে সেই সেই দেবতার কাছ থেকে কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন। কিন্তু সেই কাম্য ফল অস্থায়ী। পরমেশ্বরকে ভজনা করে জ্ঞানী অনন্ত ফলের অধিকারী হন। পরমার্থ জ্ঞানই, পরাবিদ্যাই সেই অনন্ত অক্ষয় ফল।

অবতারপুরুষ যোগমায়াতে সমাবৃত থাকেন। তাই সকলে তাঁর ঐশী মহিমা বুঝতে পারে না। অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে মাত্র বারজন মুনি ভগবান বলে জানতে পেরেছিলেন। অবতারের শক্তি লীলাবিগ্রহ ধারণে পর্যবসিত হয় না। অবতার প্রপঞ্চাতীত ভগবান, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে তিনি জানেন। কিন্তু যাঁরা অবতারের শরণাগত কেবল তাঁদের নিকট অবতার স্বীয় অব্যয় স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই জনক বসুদেব ও জননী দেবকী, মাতা যশোদা ও সখা অর্জুনকে স্বীয় দিব্যরূপ দেখিয়েছিলেন। যাদের পাপ ক্ষীণ হয়েছে, যারা বিবেকী ও বৈরাগ্যবান্ এবং যারা জরামৃত্যু হতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল তারাই উক্ত দিব্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী হন।

বার

মৃত্যুর পারে

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে পুরুষোত্তম, মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কিরূপে আপনাকে জানতে পারেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁদের কি গতি হয়?" শ্রীভগবান উত্তর দিলেন—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫

যিনি মৃত্যুকালে আমাকেই স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি মৎস্বরূপ অবগত হন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

যিনি মৃত্যুকালে যে দেবতা চিন্তা করে দেহত্যাগ করেন তিনি *সেই দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। সেই দেবতায় তাঁর ভক্তি থাকায় তিনি* তাঁকেই লাভ করেন। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে পরলোকতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত। শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ করতে করতে স্বধর্ম পালনার্থ যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পিত হলে অন্তকালে আমাকেই লাভ করবে।" কিন্তু সারা জীবন ঈশ্বরচিন্তায় অভ্যস্ত না হলে মৃত্যুকালে তাঁর কথা মনে হয় না। শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ অনুসারে অনন্য চিত্তে রোজ ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করলে মৃত্যু-মুহূর্তে তাঁর কথা স্বতঃই মনে পড়ে।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তৎপরং পুরুষং উপৈতি দিব্যম্ ॥১০

মৃত্যুকালে একাগ্র মনে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে, যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু ধারণপূর্বক ভগবানকে যিনি স্মরণ করেন তিনিই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩

ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঙ্কার জপ করতে করতে যিনি আমাকে মৃত্যুকালে স্মরণ করেন তিনি মৃত্যুর পারে পরম গতি প্রাপ্ত হন। একথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন।

ওঙ্কার ব্রহ্মবাচক শব্দ, ব্রহ্মের শব্দমূর্তি। ইহা প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের শাব্দিক প্রতীক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে *ওঙ্কারকে ব্রহ্মোড়ুপ,* ব্রহ্মলাভের ভেলা বলা হয়েছে। ওঙ্কার অনাহত ধ্বনি, নাদব্রহ্ম। হৃদয়ে এই ব্রহ্ম ধ্বনি সর্বদা উত্থিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বেও এই অনাহত নাদ সদা ধ্বনিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ধ্বনি শুনতে পেতেন। যাঁরা ধ্যান করেন তাঁরা এই ধ্বনি শুনতে পান। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস এই ধ্বনিকে বিশ্ব-সঙ্গীত (Music of the Spheres) বলতেন। ওঙ্কার ধ্বনি ব্রহ্ম থেকে আসে। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, 'ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্।' আত্মাকে ওঙ্কার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান কর। উক্ত উপনিষদে বলা হয়েছে—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যম্ উচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥

ওঁকারই ধনু, আত্মাই বাণ, এবং ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলে কথিত। অপ্রমত্ত হয়ে এই লক্ষ্যভেদ করতে হবে। অতঃপর বাণবৎ লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়ে যাবে।

যিনি অনন্যচিত্ত হয়ে যাবজ্জীবন ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তিনি ভগবানকে সহজে প্রাপ্ত হন। ভগবানকে লাভ করলে এই দুঃখালয় অনিত্য সংসারে আর পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সপ্ত ভুবনে মানুষ মৃত্যুর পর গেলে আবার দেহ ধারণ করতে হয়। কিন্তু ইহলোকে ভগবানকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রাণিবর্গ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে প্রলয়কালে প্রলীন হয়, আবার সৃষ্টিকালে কর্মাধীন হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। যতদিন না ঈশ্বরদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ হয় ততদিন জন্মমৃত্যুর চক্রে মানুষ নিয়ত ঘুরতে থাকে। একে সংসৃতি বা সংসার বলে। ঈশ্বরদর্শন হলে এই সংসৃতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এই সংসৃতি বন্ধ হওয়াকে মুক্তি বলে। ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ে মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে।

মৃত্যুর পারে দুটি সনাতন মার্গ আছে—একটি দেবযান, অপরটি পিতৃযান। দেবযানে জীবাত্মার গতি হলে মুক্তিলাভ হয়; আর পিতৃযানে গমন করলে পুনর্জন্ম নিতে হয়। দেবযানের আর একটি নাম উত্তরায়ণ বা উত্তর মার্গ এবং পিতৃযানের অপর নাম দক্ষিণায়ন বা দক্ষিণমার্গ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, দেবযান মার্গে গতি হলে যোগী যথাক্রমে অর্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, সূর্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হন। অমানব পুরুষ বা আতিবাহিক দেবতা প্রজাপতি লোক থেকে বিদ্যুৎ লোকে এসে উপাসককে প্রজাপতি লোকে নিয়ে যান। ব্রহ্মলোকের অন্য নাম প্রজাপতি-লোক। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জন-লোক, তপর্লোক, সত্য-লোক—এই সাতটা উর্ধলোক আছে।

সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকে গিয়ে উপাসক আর ফিরে আসেন না। সেখান থেকে তিনি ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি দুই প্রকার—সত্তোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। এই দেহে ব্রহ্মজ্ঞান হলে সত্তোমুক্তি লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে দেবযানে বা পিতৃযানে কোথাও যেতে হয় না। মৃত্যুর পারে তাঁর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তাঁর দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায় এবং তাঁর আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়। পিতৃযান মার্গে কর্মী পুরুষ গমন করেন। তিনি যথাক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও পিতৃলোক অতিক্রম করে চন্দ্রলোকে যান। স্বর্গকে চন্দ্রলোক বলে। স্বর্গসুখ ভোগান্তে তাঁর পুনর্জন্ম হয়। পিতৃযানে বা দেবযানে গমনকালে জীবাত্মাকে আতিবাহিক শরীর ধারণ করতে হয়। সাধারণ লোকের পিতৃযান মার্গে গতি হয়। যদি কারো সুকৃতি থাকে, তিনি কোন ঊর্ধলোকে গিয়ে কিছুকাল স্বকৃত পুণ্যের ফলভোগ করেন। কিন্তু পুণ্যক্ষয় হলে আবার তিনি মর্তলোকে ফিরে আসেন।

কেউ কেউ মৃত্যুর পরেই জন্মলাভ করে। যারা দুষ্কর্ম করে তাদের অধোগতি হয়, মানবেতর পশ্বাদি যোনিতে জন্ম হয়। কেউ কেউ মৃত্যুর পরে কিছুকাল প্রেতদেহে থাকেন। যাকে আমরা ভূত বলি সে-ই প্রেতাত্মা। তার স্থূল দেহ নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ আছে। প্রেতলোকের বর্ণনা নানা হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। হিন্দুরা পরলোকে বিশ্বাসী ও জন্মান্তরবাদী।

মুসলমানরা এবং খ্রীষ্টানরা অনন্ত নরকে ও অনন্ত স্বর্গে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টানরা বলে, মানুষ আজন্ম পাপী, original sinner. কিন্তু হিন্দু মতে স্বর্গ বা নরক অনন্ত নয়, অন্তযুক্ত। পাপক্ষয় হলে নরক থেকে

এবং পুণ্য ভোগান্তে স্বর্গ হতে মানুষ মর্তলোকে চলে আসে। মানুষ পাপপুণ্যের অতীত হলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ফিরে পায়। উপনিষদে মানুষকে অমৃতের পুত্র, অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম মহাসভায় কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "মানুষকে পাপী বলার মত মহাপাপ আর নেই।" গীতাও বজ্রনাদে বলেছেন, মানুষ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন আত্মা।

———

তের

আত্মসমর্পণ

মানুষ ভগবানকে স্থূল চক্ষে দেখতে পায় না। কিন্তু ভগবান যখন মানবদেহ ধরে মর্তে আসেন তখন সকলে তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করে। ভগবান মানবদেহে অবতীর্ণ হলেও তাঁর স্বভাব সদা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত থাকে। তাঁকে পাপ, অজ্ঞান বা মায়া স্পর্শ করতে পারে না। মূঢ়গণ তাঁর আকাশকল্প পরমার্থ স্বরূপ না জেনে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তাই তারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি পেয়ে থাকে। কিন্তু যে মহাত্মাগণের চরিত্র শম, দম, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে ভূষিত, তাঁরা অবতারের ভাগবত স্বরূপে বিশ্বাসী হয়ে অনন্য চিত্তে তাঁর ভজনা করেন। ভগবদ্ভক্তের স্বভাব সাত্ত্বিক। তিনি ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও ঈশ্বরচিন্তায় অনুরক্ত। তিনি ভগবানের গুণগান, ধর্ম-গ্রন্থাদি পাঠ বা শ্রবণ ও ভক্তিপূর্বক পূজা, জপ, প্রণামাদি দ্বারা উপাসনা করেন। নারদ পুরাণে আছে, 'কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়।' যিনি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা পটকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করেন তাঁর পুনর্জন্ম হয় না।

ভগবানের মূর্তি বা চিত্রকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণামে মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অষ্ট অঙ্গ ভূমিস্পর্শ করে। দেবমূর্তি প্রণামকালে শুধু মাথা নোয়ালেই হয় না, মনকেও নোয়াতে হয়। ভক্তি না থাকলে মন নত হয় না। উঁচু স্থানে যেমন জল জমে না, তেমনি অহংকৃত মনে ভক্তি জন্মে না। নীচু স্থানে যেমন জল সহজে

জমে, তেমনি নম্র মনে সহজে ভক্তিশ্রদ্ধা আসে। প্রণাম করবার সময় দেহমন নত করে যে প্রার্থনা করা যায় তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়।

দুর্গা প্রতিমা, সরস্বতী প্রতিমা, কালী প্রতিমা, কৃষ্ণমূর্তি, শিবলিঙ্গ প্রভৃতির সামনে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করলে, প্রণামীর পরম কল্যাণ হয়। মাতাপিতা, শিক্ষক, সাধু, পণ্ডিতাদি গুরুজনকে সভক্তি প্রণাম করলেও সেই ফল আংশিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভগবান এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ। তিনিই ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ রূপে প্রকাশিত। তিনি মানুষের একমাত্র ভর্তা, প্রভু, পাপ-পুণ্যের সাক্ষী, রক্ষক ও সুহৃৎ। তাঁতে আত্মসমর্পণ করলে তিনি আমাদিগকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁকে ভুলে থাকা বা অবিশ্বাস করার মত পাপ আর নেই। ঐহিক ধন-সম্পদে, বিদ্যায় ও বন্ধুত্বে সহজে আমরা আস্থা স্থাপন করি। কিন্তু সেই আস্থা অদৃঢ় ও অস্থায়ী। যখন বিদ্যা, সম্পদ বা সুহৃদ আমাদের সাহায্য করতে অক্ষম হয়, তখন ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা করেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২

যে ভক্তগণ অনন্যচিত্তে আমাকে উপাসনা করে সেই সদা মৎচিন্তারত ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি।

এখানে যোগ শব্দের অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম শব্দের অর্থ প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। কঠ উপনিষদে যোগক্ষেম শব্দটা শ্রেয়ো অর্থে ব্যবহৃত। বৌদ্ধ শাস্ত্র 'ধম্মপদে' নির্বাণ অর্থে যোগক্ষেম শব্দ প্রযুক্ত। কিন্তু গীতায় যোগক্ষেম শব্দের উপরোক্ত অর্থ পাওয়া যায়। ভগবান

যে সত্য সত্যই তাঁর ভক্তের সকল অভাব স্বয়ং মিটিয়ে দেন সে সম্বন্ধে এই গল্পটি শোনা যায়।

পুরীতে অর্জুন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ভগবানের পরম ভক্ত ও গীতাপাঠে অভ্যস্ত ছিলেন। ভিক্ষায়ে তাঁর জীবিকা নির্বাহ হতো। ব্রাহ্মণ বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে যা পেতেন তা ব্রাহ্মণীকে এনে দিতেন। ব্রাহ্মণী তাই রান্না করে ব্রাহ্মণকে খাওয়াতেন। পূজা-পাঠে, জপ-ধ্যানে উভয়ের দিন কাটতো। উভয়ে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। মূঢ় জনের মত তাঁরা ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করতেন না। একদিন অর্জুন মিশ্র গীতা পড়তে পড়তে উপরোক্ত শ্লোকের ভাবার্থ বুঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকের 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' অংশের অর্থ তিনি ঠিক ঠিক বুঝতে পারলেন না। উক্ত অংশের আক্ষরিক অর্থ 'আমি ভক্তের যোগক্ষেম বহন করি'। অর্জুন মিশ্র ভাবলেন, ভগবান স্বয়ং তা বহন করেন না, তিনি সম্ভবতঃ অপরকে দিয়ে বহন করান। তাঁর তালপাতায় লেখা গীতায় এই অংশটি তিনি লৌহশলাকা দিয়ে কেটে দিলেন। কয়েক দিন পরে অর্জুন মিশ্র ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। সেদিন খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। দুর্যোগের দিনে ভিক্ষা চাইলেও কেউ দ্বার খুলল না। খালি ঝুলি নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে এলেন এবং সেদিন বাধ্য হয়ে উপবাসী রইলেন। অনাহার সত্ত্বেও পূজাপাঠে ও জপধ্যানে তাঁদের বিরাম হল না। পরদিন আবার ভিক্ষার্থে বেরোলেন। বেলা অনেক হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ তখনো বাড়ী ফিরলেন না। এমন সময় তাঁর পর্ণকুটীরে এক সুদর্শন কিশোর একটি ঝুড়ি মাথায় করে এনে ব্রাহ্মণীকে দিলেন। ঝুড়িতে অনেক

ডাল, ভাত, চাল, শাক্সব্জী ও ফল-মিষ্টি ছিল। ব্রাহ্মণী কিশোরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সব কে পাঠালেন বাবা?" কিশোর বললে, 'মা, ব্রাহ্মণ পাঠিয়েছেন।" একটু পরেই কিশোরটি চলে গেল। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ রিক্তহস্তে বাড়ী এসে সে সব জিনিষপত্র দেখে অবাক হলেন এবং বুঝলেন, ভগবান স্বয়ং কিশোরবেশে ভক্তের আহার্য দ্রব্য বহন করে এনেছিলেন। তখন তাঁর ভুল ভাঙ্গলো এবং বিশ্বাস হলো, ভগবান স্বয়ংই ভক্তের সকল ভার বহন করেন এবং গীতার প্রত্যেক বাণীই বর্ণে বর্ণে সত্য।

যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে ভক্তিপূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন তাঁরাও পরমেশ্বরেরই আরাধনা করেন। কারণ ভগবানই অন্যান্য দেবতার রূপ ধারণ করে আমাদের পূজা নেন। তাই অন্যান্য দেবতার পূজাতে ভগবানেরই পূজা হয়। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতা একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। ঋগ্বেদে আছে, 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। সৎস্বরূপ ঈশ্বর একই, বিপ্রগণ তাঁকে বহুভাবে বর্ণনা করেন। ভগবানের অনন্ত রূপ, অসংখ্য নাম। তাই হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের এত রূপ ও নাম দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে ঈশ্বরকে ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। তাই আমাদের শাস্ত্রে কোটী কোটী দেবতার উল্লেখ আছে। ঈশ্বর মূলতঃ এক, অভিন্ন হলেও নাম ও রূপ অনুসারে বহু ও ভিন্ন। পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যা কিছু ভক্তিপূর্বক ভগবানকে নিবেদন করা যায় তা তিনি প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, "হে কৌন্তেয়, যা কর, যা খাও, যা আহুতি দাও, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সে সকল আমাকে সমর্পণ কর। আমাকে সকল কর্ম অর্পণ করলে তুমি শুভাশুভ ফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।"

ভগবান সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজিত। কেউ তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক তাঁর ভজনা করেন ভগবান তাঁদের হৃদয়ে সদা বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।' যে সুদুরাচার ব্যক্তি অনন্যা ভক্তির সহিত ভগবানকে ভজনা করেন তিনিও ভগবদ্ভক্ত, তিনিও সাধু। তিনি শীঘ্র ধর্মাত্মা হন এবং শাশ্বতী শান্তি লাভ করেন। ভগবানের ভক্ত কখনো বিনষ্ট হন না। ঋগ্বেদে আছে, "ন হন্যতে ন জীয়তে ত্বোতো নৈনমংহো অশ্নোত্যন্তিতো ন দূরাৎ।" হে ভগবান, তুমি যাকে রক্ষা কর কেউ তার বিনাশে বা পরাভবে সমর্থ হয় না। পাপ দূর বা নিকট থেকে তাকে স্পর্শ করতে পারে না। নারীগণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ এবং পাপজন্মা ব্যক্তিগণ ভগবানের ভজনা করে পরাভক্তি ও পরাগতি লাভ করেন। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে বল্লেন, 'অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'। এই অনিত্য, সুখহীন মর্ত্যলোকে জন্ম নিয়ে অন্য সমস্ত কর্তব্য ছেড়ে আমারই চিন্তা কর।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ষোল আনা হলে বিশুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ প্রার্থনা করেছিলেন—

যা প্রীতিঃ অবিবেকিনাং বিষয়েষু অনপায়িনী।
ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াৎ মাপসর্পতু ॥

হে ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহে অবিবেকিগণের, মূঢ়গণের

যেরূপ অচলা প্রীতি আছে তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় থেকে সেরূপ প্রীতি যেন কখনো অপসৃত না হয়।

ভক্তির পরিপক্ব অবস্থায় প্রহ্লাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছিল। একথা ভাগবতে আছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান এক। পারস্যের সুফী কবি ওমর খৈয়ামের নিম্নোক্ত রূপকে এ ভাবটী সম্যক্ পরিস্ফুট। প্রেমিক প্রেমিকার গৃহে রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে বল্লেন, কপাট খোল। প্রেমিকা জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? প্রেমিক উত্তর দিলেন, আমি। প্রেমিকা—আরো কিছু কাল তপস্যা করে এসো। প্রেমিক তদনুযায়ী কিছুকাল সাধন ভজনান্তে এসে প্রেমিকার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করলেন। ভেতর থেকে পূর্ববৎ প্রশ্ন হলো, কে তুমি? প্রেমিক বল্লেন, তুমিই। তখনি দ্বার উদ্‌ঘাটিত এবং প্রেমিকা ও প্রেমিকের মিলন হলো। রাজপুতানার মহাসাধিকা মীরাবাই তাই বলতেন—

যব্ ম্যায় থা তব হরি নহি, অব হরি হ্যায় ম্যায় নাহি।
প্রেম-গলি অতি সাঁকরি তা মে দো ন সমাহি॥

যখন হৃদয়ে 'আমি' ছিল তখন হরি আসেন নি। এখন হরি আছেন, 'আমি' নাই। প্রেম-গলি অতি সংকীর্ণ। তাতে দুজন যেতে বা আসতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন, 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। ইহাই আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা।

———

চৌদ্দ

ভগবানের বিভূতি

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেউ ভগবানের উৎপত্তি জানেন না। কারণ, তিনি সর্বপ্রকারে দেবতাগণ ও মহর্ষিগণের আদি। যিনি ভগবানকে অজ অনাদি ও সমগ্র বিশ্বের মহেশ্বর বলে জানেন, মর্ত্যমধ্যে তিনিই অসংমূঢ় ও পাপমুক্ত হন।

অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ, বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, ভয়, অভয়, জন্ম, মৃত্যু— এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাণিগণের স্ব স্ব কর্মানুসারে ঈশ্বর হতে উৎপন্ন হয়।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "হে পার্থ, মহর্ষি ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এবং সনৎ, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন এবং স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি মনু আমার মানস পুত্র। তারা মদ্গতচিত্ত ও মৎশক্তি-সম্পন্ন। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি এবং স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দ মনু এই জগতে সকল প্রজা সৃষ্টি করেছেন।"

যিনি ভগবানের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য জানেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হন। ভগবান সর্বজগতের উৎস। তাঁ থেকে এই বিশ্ব সৃষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞগণ এতে বিশ্বাসী হয়ে ভগবানের ভজনা করেন। সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছটা শক্তিকে ভগ বলে।

পূর্ণভাবে এই ছটী শক্তি যাঁতে বিদ্যমান তিনি ভগবান। মানবদেহ ধারণ করলেও ভগবানের এই ছটী শক্তি অলুপ্ত থাকে। নিঃস্বার্থভাবে যাঁরা কেবল প্রীতিপূর্বক ভগবানের ভজনা করেন তাঁদের হৃদয়ে ভগবান ভাস্বর জ্ঞান-দীপরূপে প্রকাশিত হন। তাঁদের হৃদয়ে বহু জন্ম ধরে যে অন্ধকার ছিল তা তৎক্ষণাৎ অপসৃত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন, "হাজার বছরের অন্ধকার যেমন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে মুহূর্তে অপসৃত হয় তেমনি ঈশ্বর দর্শন হলে মানুষ বহু জন্মের অজ্ঞান থেকে মুক্তি পায়।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, "হে ভগবান, আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পাবন। আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্য পুরুষ ও আদিদেব। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাসদেব আপনাকে উক্ত রূপে বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে এরূপ বলেছেন। হে ভগবান, দেবতাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ আপনার এই অবতার লীলা দেবগণও জানেন না এবং অসুরদের নিগ্রহার্থ আপনার এই অভিব্যক্তি অসুরগণও অবগত নয়। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে, আপনিই আপনার স্বরূপ জানেন, অপরে জানে না। একাধারে আপনি সোপাধিক ও নিরুপাধিক, সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ।

আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপ্ত করে রয়েছেন সে সকল দিব্য বিভূতি সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। হে প্রভু, কোন্ কোন্ বস্তুতে আপনাকে আমি ধ্যান করবো সেই ধ্যেয় বস্তুগুলি আমাকে কৃপা করে বলুন। আপনার কথামৃত পান করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না; আমি আপনার কথা আরও শুনতে চাই।"

শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিগুলি তোমাকে বলবো। কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নাই। হে গুড়াকেশ, আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আত্মা। আমি ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি অংশুমান্ রবি। উনপঞ্চাশ মরুতের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র। চতুর্বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র। আমি সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তক মন[১] এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরক্ষগণের মধ্যে বিত্তেশ, অষ্ট বসুর মধ্যে পাবক এবং শিখরিগণের মধ্যে মেরুপর্বত। আমি পুরোহিত-গণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনানীগণের মধ্যে স্কন্দ এবং দেবখাত জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর।"

"আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে একাক্ষর ওঁ, যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবরসমূহের মধ্যে হিমালয়। আমি সর্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি। আমি অশ্বসমূহের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত এবং নরগণের মধ্যে রাজা। আমি আয়ুধসমূহের মধ্যে বজ্র, গাভীসমূহের মধ্যে কামধেনু[২], প্রাণিগণের মধ্যে কন্দর্প[৩] এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকী।"

---

১ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন।

২ কামধেনু বার মাস দুধ দেয়।

৩ মদন, কামদেব।

"আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলদেবতাগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং নিয়ামকগণের মধ্যে যম। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণকদের মধ্যে কাল, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র[১] এবং পক্ষিগণের মধ্যে বৈনতেয়[২]। আমি বেগবানদিগের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রামচন্দ্র, মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীগণের মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জুন, আমি আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা। বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকগণের মধ্যে সুতর্ক। আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার ও সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আমি অক্ষয় কাল এবং সর্বতোমুখ বিধাতা।"

"আমি সর্বহর মৃত্যু, ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষ। আমি নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা[৩]। আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী[৫], বার মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ[৪] এবং ষড় ঋতুর মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত। আমি ছলনাকারিগণের মধ্যে দ্যূত[৬], তেজস্বীগণের তেজ, বিজয়িগণের বিজয়, উদ্যমকারিগণের উদ্যম এবং সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব। আমি বাষ্ণেয়গণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য। আমি শাসকগণের দণ্ড, জিগীষুগণের নীতি এবং গুহ্যবিষয়সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান।"

"হে অর্জুন, যা সর্বভূতের বীজ তাও আমি। স্থাবর বা জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই যা আমা ব্যতীত সত্তাবান্ হতে পারে। আমার

১ সিংহ। ২ গরুড়। ৩ ধর্মের সপ্ত পত্নী ৪ অগ্রহায়ণ। ৫ গায়ত্রী মন্ত্র, ব্রাহ্মণের নিত্য জপনীয়। ৬ অক্ষ বা পাশা।

বিভূতিসমূহের অন্ত নেই। তাই প্রধান বিভূতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমান্ বা উর্জিত সে সবই আমার শক্তির অংশীভূত বলে জানবে। অথবা, হে অর্জুন, আমার বিস্তৃত বিভূতির কথা জানবার কি প্রয়োজন? এইমাত্র জেনে রেখো যে, আমি কেবল একপাদ দ্বারা কৃৎস্ন জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি।" ব্রহ্মের একপাদে সর্বভূত উৎপন্ন এবং তিন পাদ স্বর্গে অক্ষয় আছে।

পনের

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বল্লেন, "হে ভগবান্, আপনার বাক্যে আমার মোহ বিগত হয়েছে। এখন আমি আপনার বিশ্বরূপ দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। আমি যদি আপনার বিশ্বরূপ দেখ্‌বার যোগ্য হই তাহলে কৃপা করে আমাকে তা দেখান।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন, "হে পার্থ, তোমার প্রাকৃত চর্মচক্ষু দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ হবে না। আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান-চক্ষু দিচ্ছি। উহার দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর রূপ দেখ।" এই বলে তিনি স্বীয় সখাকে নিজের বিশ্বরূপ দেখালেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপে অনেক বদন ও অনেক নয়ন, অনেক অদ্ভুত রূপ, অনেক দিব্য আভরণ এবং অনেক উদ্যত আয়ুধ ছিল। ভগবানের বিশ্বরূপ দিব্য মাল্যে ও দিব্য অম্বরে ভূষিত, দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত, অতীব আশ্চর্য্যময় ও দ্যুতিমান্, অনন্ত ও বিশ্বতোমুখ। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয় তাহলে তা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ সদৃশ হতে পারে।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট শরীরে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদিরূপে বিভক্ত সমগ্র বিশ্বকে অবয়বরূপে একত্রিত দেখলেন। তিনি বিশ্বরূপ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত হয়ে করজোড়ে অবনত মস্তকে বিশ্বরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্বক এরূপে স্তব করলেন।—

"হে দেব, আপনার এই বিশ্বরূপে সমস্ত দেবতা ও চরাচর জগৎ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকী প্রভৃতি সর্পসমূহ এবং কমলাসনস্থ সৃষ্টিকর্তা

ব্রহ্মাকে দেখছি। হে বিশ্বেশ্বর, আপনার যে অনন্তরূপ দেখছি তাতে, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র আছে। হে বিশ্বরূপ, আমি আপনার আদি, অন্ত ও মধ্য দেখছি না। আমি সর্বত্র আপনাকে দেখছি। আপনি কিরীটী, গদাধর ও চক্রধর, তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রভাময় ও অপ্রমেয়। আপনি অক্ষর পুরুষ এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি বিশ্বের পরম আশ্রয় এবং শাশ্বত ধর্মের গোপ্তা। আপনি অব্যয় ও সনাতন পরব্রহ্ম। আমি দেখছি, আপনি অনাদি, মধ্যহীন, অনন্ত, অমিতবীর্য্য ও অসংখ্য-বাহু। চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার নেত্র। আপনার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির তেজ পুঞ্জীভূত। আপনি স্বতেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছেন। হে ভগবান্, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং দশ দিক্ আপনি পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আপনার এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে ত্রিলোক অতিশয় সন্ত্রস্ত হয়েছে।"

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে অর্জুনের আশঙ্কা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের সেই সন্দেহ দূরীভূত হলো। কারণ অর্জুন দেখলেন, "বসু আদি যে দেবতাগণ মনুষ্যদেহে শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভূভার হরণার্থ অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা যুধ্যমান অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপে প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করযোড়ে বিশ্বরূপী ভগবানের গুণগানে নিরত। মহর্ষিগণ ও সিদ্ধ-সংঘ "জগতের কল্যাণ হোক" বলে প্রচুর স্তুতিবাক্যে তাঁর মহিমা-কীর্তনে নিযুক্ত। রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ, সাধ্যগণ ও বসুগণ, বিশ্ব নামক দেবতাগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়[১], মরুৎগণ ও অর্যমাদি পিতৃগণ, হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব,

১ দেববৈদ্যদ্বয়

কুবেরাদি যক্ষ, বিরোচনাদি অসুর, এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ বিস্মিত হয়ে অর্জুনের মত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে লাগলেন।

পুনরায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করলেন, "হে মহাবাহো, আপনার বিরাট রূপে বহু বক্তু, বহু নেত্র, বহু বাহু, বহু উরু, বহু পদ, বহু উদর দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা উহা অতিশয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। তা দেখে সমস্ত প্রাণী এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হয়েছি। হে ভগবান, আপনার নভস্পর্শী, প্রদীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল বিশাল নয়ন দেখে আমার চিত্ত ব্যথিত হয়েছে এবং আমি ধীর ও শান্ত থাকতে পারছি না। হে দেবেশ, আপনার দংষ্ট্রা-করাল প্রলয়াগ্নিতুল্য মুখসমূহ দেখে আমার দিক্‌ভ্রম হচ্ছে। হে জগন্নিবাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আমি দেখছি, উভয় পক্ষের প্রধান যোদ্ধৃবৃন্দ আপনার দংষ্ট্রা-করাল[১] ভয়ানক মুখগহ্বরে অতি দ্রুত বেগে প্রবেশ করছে। কেউ কেউ আপনার বিশাল মুখে প্রবিষ্ট ও চূর্ণিত হয়ে ভক্ষিত মাংসখণ্ডসমূহের ন্যায় আপনার দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন আছে। যেমন নদী-স্রোতগুলি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে বিলীন হয় তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রের বীরগণ আপনার বিশ্বরূপের জ্বলন্ত মুখ-বিবরে প্রবেশ করছে।"

"পতঙ্গগণ যেমন ক্ষিপ্রগতিতে মরণের জন্যই জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দেয় সেরূপ এই যোদ্ধৃবৃন্দও মৃত্যুর নিমিত্ত আপনার মুখ-গহ্বরসমূহে প্রবেশ করছে। হে ভগবান্, জ্বলন্ত মুখসমূহ দ্বারা আপনি দুর্যোধনাদি সকলকে গ্রাস করছেন। আপনার তীব্র তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত হচ্ছে। হে বিষ্ণু, আপনার এই উগ্ররূপ ধারণের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না।"

১ বড় দাঁত

শ্রীভগবান অর্জুনকে বল্‌লেন, "আমি লোক সংহারে প্রবৃত্ত মহাকাল। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন তাঁরা কেউই জীবিত থাকবেন না। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও এবং যশোলাভ কর। শত্রুবর্গকে পরাজিত করে সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।"

'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রম্‌ ভব সব্যসাচিন্‌।'

হে সব্যসাচী,[১] এরা পূর্বেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। তুমি নিমিত্তমাত্র হও।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধৃগণকে অর্জুন খুব ভয় করতেন এবং তাঁদের পরাজয় করা বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাই ভগবান তাঁদের নাম করে অর্জুনকে বল্‌লেন, "আমি এদের পূর্বেই বধ করেছি। সেই মৃতদিগকে তুমি বধ কর। ভয় পেয়ো না, বা যুদ্ধজয়ে সন্দিহান হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই হারিয়ে দেবে। অতএব, নিমিত্তমাত্র হয়ে যুদ্ধ কর।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অভয়-বাণী শুনে অর্জুন অসীম সাহস পেলেন। তিনি অন্তরে বুঝতে পারলেন, তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। তাই কম্পিত দেহে করযোড়ে প্রণামপূর্বক তাঁকে গদ্‌গদ স্বরে স্তব করলেন। শেষে বললেন—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্ব
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥
নমঃ পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতস্তে
নমস্তু তে সর্বত এব সর্ব ॥ ৩৯-৪০

১ যিনি সব্য (বাম হাতে) বাণনিক্ষেপে সমর্থ।

আপনাকে সহস্র বার প্রণাম করি। আপনাকে পুনরায় বারবার প্রণাম করি। হে সর্বস্বরূপ, আপনাকে সম্মুখে প্রণাম করি, পশ্চাতে প্রণাম করি, সকল দিক থেকেই প্রণাম করি।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখা ভেবে অনেক সময় অবিনয়ে নানাভাবে তাঁকে সম্বোধন করতেন। তিনি আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনাদি কালে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে, একাকী বা বন্ধুর সামনে পরিহাস-ছলে তাঁকে অনেক কথা বলতেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ তিনি কখনও দেখেন নি। এখন সখার বিশ্বরূপ দেখে তাঁর মনে অনুতাপ এলো। তাই পূর্বকৃত অসম্মান বা অমর্যাদার জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইলেন, এবং বললেন—

'ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো।' ত্রিভুবনে আপনার সমান বা অধিক কে হতে পারে? হে মহাদেব, আপনি পূজনীয় ঈশ্বর। আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি। আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনীয়! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন আপনিও তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার অদৃষ্টপূর্ব বিশ্বরূপ দেখে আমি ভয় পেয়েছি। আপনি কৃপা করে আমার অতি প্রিয় সেই পূর্বরূপ আমাকে দেখান। হে সহস্রবাহো! আমি আপনাকে পূর্ববৎ কিরীট-চক্র-গদাধারী রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্তে! আপনার সেই চতুর্ভুজ মানব মূর্তি ধারণ করুন।"

অর্জুনকে ভীত দেখে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ উপসংহার পূর্বক চতুর্ভুজ মানব মূর্তি ধারণ করলেন। এ থেকে প্রতীত হয়, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা চতুর্ভুজরূপে দেখতেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রিয় বাক্য দ্বারা আশ্বস্ত করে বললেন, "তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে এই বিশ্বরূপ দেখালাম।

তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এই বিশ্বরূপ দেখেনি।" শ্রীকৃষ্ণের সৌম্যমূর্তি পুনরায় দর্শন করে অর্জুন প্রসন্ন ও প্রকৃতিস্থ হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শেষে বললেন, "তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দেখলে তা ব্রহ্মাদি দেবতাদেরও আকাঙ্ক্ষিত। কঠোর তপস্যা, বেদপাঠ বা যজ্ঞদানাদির দ্বারা এই বিশ্বরূপ দেখা যায় না। কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন হয়।" অর্জুনের সেই ভক্তি ছিল বলেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দুটো রূপ ছিল—একটি নররূপ, অপরটি বিশ্বরূপ। নররূপে তিনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। এ রূপটা অর্জুনাদি সকলের দৃষ্টিগোচর হতো। এ রূপের ছবি সর্বত্র দেখা যায়, এরূপের মূর্তি সর্বত্র পূজিত হয়। এ রূপের পশ্চাতে লুকায়িত ছিল তাঁর বিশ্বরূপ, যেটি অর্জুন দিব্য চক্ষুতে দেখেছিলেন এবং ভক্তরা ধ্যানে দেখতে পান। বিশ্বরূপ চর্মচক্ষে দেখা যায় না। একটি টাকার এপিঠ ওপিঠ যেমন, শ্রীকৃষ্ণের নররূপ ও বিশ্বরূপ তেমনি অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে মাতা যশোদাকে স্বীয় বিশ্বরূপ একাধিক বার দেখিয়েছিলেন। ভাগবতে এ গল্পটি আছে। একদা বলরামাদি বালকেরা খেলতে খেলতে এসে মাতা যশোদাকে নিবেদন করলো, "দেখুন মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে!" হিতৈষিণী মা যশোদা শিশু কৃষ্ণের হাত ধরে তিরস্কার করে বললেন "মাটি খেলি কেন বাবা? ননী চাইলে আমি দিতুম।" কৃষ্ণ বল্‌করে "মা, আমি তো মাটি খাইনি! এরা সকলে মিথ্যা কথা বলছে। প্রেমিক সামনে আমার মুখ দেখ।" এই বলে শিশু কৃষ্ণ মুখ ব্যাদান ভগবদ্ভক্ত যশোদা চেয়ে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরা

যিনি নিঃস্পৃহ, বাইরে ও ভেতরে পবিত্র, কর্মপটু, পক্ষপাতশূন্য, ভয়মুক্ত এবং স্বার্থগন্ধহীন তিনি ভগবানের প্রিয় ভক্ত।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি ইষ্টলাভে হৃষ্ট হন না, অনিষ্ট প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয় বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য চেষ্টিত হন না এবং শুভাশুভ উভয়ই পরিত্যাগ করেন তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

যিনি আসক্তিহীন, শত্রুমিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে উৎফুল্ল বা অপমানে বিষণ্ন হন না, যিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বে অবিচলিত, মৌনী, সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, অনিকেত, স্থিরমতি ও ভক্তিমান্ তিনি ভগবানের প্রিয় ভক্ত।

মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে, যিনি যে কোন পরিধেয় দ্বারা দেহ আবৃত করেন, যে কোন খাদ্য ভোজনে তৃপ্ত হন দেবগণ তাঁকে ভগবানের প্রিয় ভক্ত বলেন।

উপরোক্ত গুণাবলী ঈশ্বরভক্তের স্বাভাবিক। সেগুলি আমরা যতই সাধন করবো ততই ভগবানের প্রিয় ভক্ত হতে পারবো। ভক্ত উপরোক্ত গুণাবলীতে অলঙ্কৃত হন। ভগবদ্ ভক্তি লাভ হলে জীবনে এই সকল সদ্গুণ বিকশিত হয়। সদ্গুণরাজি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ। একটা এলে অন্য সব গুলি পর পর আসে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন, "পুকুরে কলমি শাকের দল ভাসে। একটা কলমি দল ধরে টানলে সমস্ত দলটা ক্রমে ক্রমে কাছে আসে।" সদ্গুণাবলী জীবনে প্রকটিত হলে অসৎ গুণগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়।

সতের

দেহ ও দেহী

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ ও দেহীর, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ প্রদর্শিত। দেহ দৃশ্য, অনাত্মা। দেহী দ্রষ্টা, আত্মা। দেহ অনিত্য, নশ্বর; দেহী নিত্য, অবিনশ্বর। সম্রাট আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি এক হিন্দু যোগীকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। উক্ত যোগী আত্মজ্ঞ ও মৌন ছিলেন। সম্রাট যোগীকে গ্রীস দেশে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। আত্মতৃপ্ত যোগী হাত নেড়ে সম্রাটের সঙ্গে গ্রীসে যেতে অসম্মতি জানালেন। তখন সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে তরবারি খুলে যোগীকে ভয় দেখিয়ে বল্লেন, "তুমি যদি না যাও তোমাকে এই অসি দিয়ে কেটে ফেল্‌বো।" তূষ্ণী জ্ঞানী অবজ্ঞাসূচক অট্টহাস্য করে বল্লেন, "সম্রাট, তুমি এত বড় মিথ্যা কথা জীবনে আর কখনো বলো নি। তুমি কি আমাকে কাটতে পার? আমি অমর আত্মা। আমাকে কোন অস্ত্র ছিন্ন করতে পারে না।"

সকল দেহের দ্রষ্টা দেহী এক ও অদ্বৈত। তিনিই পরমাত্মা। ব্রহ্মা হতে স্তম্ব পর্যন্ত সর্বদেহে এক পরমাত্মা বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। দেহ পঞ্চ ভূতে গঠিত। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—সবই দেহবৎ অনিত্য, অনাত্মা, উপাধিমাত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, শ্বেতকেতুকে গুরু বল্‌ছেন, তত্ত্বমসি। তত্ত্বমসি বাক্যের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয়, তৎ + ত্বম্ + অসি। অর্থাৎ সেই (আত্মাই) হও তুমি। উপনিষদে ও গীতায় একই আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত। যে পরমাত্মা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত তিনিই সকলের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজিত।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪

সকল শরীরের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ, তাঁহারই হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ, মস্তক ও মুখ। তিনি সারা জগৎ জুড়ে রয়েছেন। আত্মা বিশ্বব্যাপ্ত। সর্বদেহে, সর্বলোকে ও সর্বজ্যোতিষ্কে এক আত্মা বিরাজমান।

দেহী সর্বেন্দ্রিয়-বর্জিত। তিনি সকল অন্তরিন্দ্রিয়ের ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য দ্বারা অবভাসিত। কিন্তু তিনি কোন ইন্দ্রিয়-কার্য্যে লিপ্ত নন। তথাপি মরুভূমি যেমন মৃগতৃষ্ণিকার আশ্রয়, সেরূপ তিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠান। তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম বলে তিনি দুর্বিজ্ঞেয়। তিনি অজ্ঞানীর নিকট অজ্ঞাত বলে অতি দূরে এবং জ্ঞানীর নিকট আত্মারূপে জ্ঞাত বলে অতি নিকটে। তিনি আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কসমূহেরও জ্যোতিঃ। মহানারায়ণ উপনিষদে আছে, তাঁর তেজে জ্যোতিষ্মান্ হয়ে সূর্য্য কিরণ দেন। তিনি অজ্ঞানান্ধকারের দ্বারা অসংশ্লিষ্ট। আত্মজ্ঞানের অসম্ভাবনা অকর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্যই বলতেন, "হাজার বছরের অন্ধকার একটি দেশলাই কাঠি জ্বাললে মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হয়।" অর্থাৎ বহু জন্মের পাপরাশিও জ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হয়।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। গুরুদত্ত সাধন নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাস করলে আত্মজ্ঞ হওয়া যায়। 'আমি দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধিও নয়; আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা।' এই নিশ্চয় যত দৃঢ় হবে ততই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধ হবে। আত্মজ্ঞান লাভ হলে স্বদেহে ও পরদেহে এক আত্মাই অনুভূত হয়। কোন

মৌন আত্মজ্ঞ পর্বত-গুহায় বাস করতেন। পনের বৎসর তিনি আত্মজ্ঞানের অনুপম মহানন্দে বিভোর ও নির্বাক্ ছিলেন। একদিন হঠাৎ এক বাঘ এসে তাঁকে মুখে করে নিয়ে চলে যায়। যখন জ্ঞানী বাঘের মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হলেন তখনও তিনি বলতে লাগলেন, তৎ ত্বমসি, তুমিও সেই। যতই দূরে বাঘটা চলে গেল ততই আত্মজ্ঞের স্বর ক্ষীণ হতে লাগলো। বাঘের মুখে কবলিত হয়েও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁর মুখে ধ্বনিত হলো উপনিষদের মহাবাক্য তত্ত্বমসি। আজও হিমালয়ের আকাশে বাতাসে অনাহত ধ্বনি নিনাদিত হচ্ছে, তত্ত্বমসি, তুমি সেই আত্মা। যিনি সেই ধ্বনি শোনেন তিনি অমর হন।

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২

হে কৌন্তেয়, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বলে অব্যয়। তাই তিনি শরীরে অবস্থিত হয়েও কোন কর্ম করেন না, কোন কর্ম-ফলে লিপ্ত হন না। যেমন সর্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সর্ব বস্তুতে ওতপ্রোত হয়েও সৌক্ষ্ম্যহেতু কোন বস্তুতে লিপ্ত হন না, তেমনি সর্ববস্তুতে থেকেও দেহী কোন দৈহিক দোষে বা গুণে জড়িত হন না। যেরূপ একমাত্র সূর্য্য সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেন সেরূপ এক দেহী সর্বদেহে প্রকাশিত।

আঠার

সত্ত্ব রজঃ তমঃ

প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। গুণত্রয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গীরূপে সম্বদ্ধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে আসক্তি মানুষের সংসৃতির কারণ। সেজন্য ত্রিগুণের শক্তি, ত্রিগুণে আমাদের আসক্তি কিরূপ এবং তারা পুরুষকে কি ভাবে সংসারে বাঁধে, ইত্যাদি বিষয় গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বল্লেন, "হে মহাবাহো, প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ অব্যয় দেহীকে দেহাসক্তি দ্বারা দেহে আবদ্ধ করে। হে অনঘ, সত্ত্ব গুণ স্ফটিক মণির ন্যায় স্বচ্ছ, আত্মানন্দের অভিব্যঞ্জক এবং আত্মচৈতন্যের প্রকাশক। ইহা 'আমি সুখী' এবং 'আমি জ্ঞানী' এরূপ অভিমান দ্বারা আত্মাকে যেন দেহে বেঁধে রাখে। কারণ, আত্মার বন্ধন মায়িক, পারমার্থিক নয়। হে কৌন্তেয়, রজো গুণ রাগাত্মক। রাগ শব্দের অর্থ রঞ্জন। রঞ্জনই রজো গুণের স্বভাব। যেমন গৈরিকাদি দ্রব্য যাতে সংলগ্ন হয় তাকে রঙীন করে সেরূপ রজোগুণ কর্মের প্রবৃত্তিতে মনকে রাঙিয়ে দেয়। রজোগুণ মনে এলে অপ্রাপ্ত বস্তু পেতে এবং প্রাপ্ত বস্তুকে ভালবাসতে ইচ্ছা জন্মে এবং কর্মস্পৃহা জাগে। হে ভারত, তমোগুণ হিতাহিত বিবেকের প্রতিবন্ধক। উহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা বাড়ায়। যখন তমোজাত প্রমাদ আসে তখন মানুষ কার্যান্তরে ব্যাপৃত হয়ে যথাসময়ে কর্তব্য করতে ভুলে যায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্ত্বগুণের উদয় হলে মানুষ ঈশ্বর চিন্তা

করে। সত্ত্ব সুখে, রজঃ কর্মে এবং তমঃ প্রমাদ ও আলস্যে সকলকে নিমজ্জিত করে। সত্ত্ব রজোকে, রজঃ তমোকে অভিভূত করে। এই ভোগায়তন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ দ্বারা উদ্‌ভাসিত হয় তখন বুঝতে হবে সত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়েছে। মনের প্রসন্নতা, দেহের লঘুতা সত্ত্ব-বৃদ্ধির লক্ষণ। লোভ, কর্ম-স্পৃহা, কর্ম-চেষ্টা, উৎফুল্লতা, অনুরাগ, এবং ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষাদি রজোবৃদ্ধির চিহ্ন। বিবেকাভাব, কর্তব্যে অবহেলা, মূঢ়তা, অনুদ্যম প্রভৃতি তমোবৃদ্ধির সময়ে দেখা দেয়।

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-কালে মৃত্যু হলে জীবাত্মা সুখময় ঊর্ধলোকে চলে যায়। রজোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কর্মভূমি মনুষ্যলোকে জন্ম হয়। তমোগুণ বৃদ্ধির সময় দেহত্যাগ হলে লোকে পশ্বাদি নীচ যোনি লাভ করে। শিষ্টগণ বলেন, সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা। তমোগুণী পশুবৎ মূঢ় ও জড়।

দেশের অধিকাংশ নরনারীকে তামসিক দেখে স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদের বলেছিলেন, তোমরা গীতা না পড়ে ফুটবল খেললে ঈশ্বরের অধিক সমীপবর্তী হবে। তমোগুণীরা গীতার বজ্র-বাণী বুঝতে পারে না। তমোগুণীর দেহে যেমন জড়তা তার মনেও তেমনি জড়তা থাকে। তমঃ প্রভাবে দেহের শক্তি প্রকটিত হয় না, মনে উচ্চ চিন্তা করা যায় না। তমঃ পশুত্বের, রজঃ নরত্বের এবং সত্ত্ব দেবত্বের লক্ষণ।

সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের প্রভেদ বোঝাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই গল্পটি বলতেন। একদা কোন পথিক পথ ভুলে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। সে অরণ্যে তিনটি ডাকাত থাকতো এবং পথহারা পথিকদের

সর্বস্ব লুণ্ঠন করতো। উক্ত পথিককে দেখেই প্রথম ডাকাত বল্লে, "একে মেরে ফেলে সব কেড়ে নাও।" দ্বিতীয় ডাকাত একটু হৃদয়বান্ ছিল। সে বাধা দিয়ে বল্লে, "একে মেরে লাভ কি? একে বেঁধে সব কেড়ে নাও।" অবিলম্বে তাই করা হলো। তখন তৃতীয় ডাকাত পথিকটাকে পথ দেখিয়ে অরণ্যের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে তাকে বল্লে, "এবার তুমি চলে যাও। আর আমি যাবো না। আমি গ্রামে গেলে পুলিসে আমাকে ধরবে।" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডাকাত যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণ। অরণ্য ত্রিগুণের রাজ্য। সেই রাজ্যে মানুষ গেলে ত্রিগুণের অধীন হয়ে পড়ে। বাইবেলের নিম্নলিখিত উপাখ্যানে উক্ত ভাব সুস্পষ্ট। আদাম ও ইভ যখন স্বর্গে ছিলেন তখন উভয়ে নগ্ন থাকতেন। সংকোচ বা লজ্জা তখন তাঁদের আদৌ ছিল না। আদাম আদি পুরুষ, ইভ আদি নারী। কিন্তু যখন তাঁরা সংসাররূপ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেলেন তখন সংকোচ ও লজ্জায় উভয়ে অভিভূত হলেন।

ত্রিগুণই কার্য্য-কারণরূপে পরিণত এবং সকল কর্মের কর্তা। ত্রিগুণই দেহোৎপত্তির কারণ। আত্মা ত্রিগুণের অতীত এবং তাদের সকল কার্য্যের সাক্ষী, দ্রষ্টা। ত্রিগুণ অতিক্রম করলে জীবনকালেই জন্ম, জরা ও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং অমৃতত্ব লাভ হয়। ত্রিগুণাতীত মানুষ দেবতুল্য।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ভগবান্, গুণাতীতের লক্ষণ কি? তাঁর আচরণ কিরূপ? কি উপায়ে গুণাতীত হওয়া যায়?" শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বল্লেন, "হে পাণ্ডব, সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের কার্য্য যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হলে যিনি

দ্বেষ করেন না এবং এগুলি নিবৃত্ত হলে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই গুণাতীত। উদাসীন ব্যক্তি যেমন কারো পক্ষ অবলম্বন করেন না, সেরূপ যিনি ত্রিগুণের কার্য্য দ্বারা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হন না এবং মনে করেন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়ই ত্রিগুণের পরিণাম তিনিই গুণাতীত। যিনি সুখে স্পৃহাহীন, দুঃখে দ্বেষশূন্য ও আত্মস্বরূপে আরূঢ় মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁর সমদৃষ্টি এবং প্রিয়াপ্রিয় ও নিন্দা-স্তুতিতে যাঁর সমবুদ্ধি তিনিই গুণাতীত। যিনি সম্মানে ও অপমানে নির্বিকার, যিনি শত্রুপক্ষে নিগ্রহ ও মিত্রপক্ষে অনুগ্রহ করেন না, যিনি কেবলমাত্র দেহধারণের উপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই গুণাতীত। যিনি ঐকান্তিকী ভক্তি সহায়ে ঈশ্বরের আরাধনা করেন তিনিই ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মজ্ঞানী হন।”

উনিশ

পুরুষোত্তম

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে এই সংসারকে ব্রহ্ম-বন ও ব্রহ্ম-বৃক্ষ বলা হয়েছে। পশুরাজ যেমন বনের সর্বত্র বিচরণ করে তেমনি দেবরাজ ব্রহ্ম এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। কঠ উপনিষদে এই সংসার ঊর্ধমূল ও অধঃশাখ অশ্বত্থরূপে বর্ণিত। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, এই সংসার অব্যয়, অশ্বত্থ। ইহার মূল ঊর্ধে এবং শাখা নিম্নে বিস্তৃত। অশ্বত্থ শব্দের অর্থ ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণস্থায়ী। যা শ্ব (কাল) পর্যন্ত স্থায়ী হয় না তাকে সংসার বলে। সংসারের সব কিছুই অনিত্য, অস্থায়ী। যা কাল ছিল তা আজ নেই। যা আজ আছে তা কাল থাকবে কি না অনিশ্চিত। সংসার অনাদি, কিন্তু সান্ত। সংসারের আদি আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কবে সংসার সৃষ্ট হলো তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু ইহা সান্ত, অন্তযুক্ত। ঈশ্বরদর্শন হলে সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধ হয়। প্রবাহাকারে এই সংসার অনন্ত। স্রোতের জল সদা প্রবহমান থাকা সত্ত্বেও যেমন পূর্ববৎ দেখা যায় তেমনি সংসার পরিবর্তনশীল হলেও সর্বদা দৃশ্যমান থাকে।

যতক্ষণ আমরা সংসারে থাকি ততক্ষণ এর অতীত সনাতন সত্তাটি জানতে পারি না। যতক্ষণ স্বপ্ন বা মরীচিকা দেখা যায় ততক্ষণ তার নশ্বরত্ব বুদ্ধিগত হয় না। অসঙ্গ-শস্ত্র দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের দৃঢ় মূল ছেদন করলে অব্যয় ব্রহ্মপুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মান, মোহ ছেড়ে, সঙ্গদোষ জয় করে, ধর্মনিষ্ঠ ও নিষ্কাম হয়ে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব

থেকে মুক্ত হলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ভগবান ব্রহ্মপদের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন।—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তৎ ধাম পরমং মম ॥৬

তথায় সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ভাসমান নয়। যেখানে গেলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না তাহাই আমার পরম ব্রহ্মপদ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মপদ ব্রহ্মধাম নামে অভিহিত। কঠ উপনিষদে ব্রহ্মপদের এই সুন্দর বর্ণনাটি পাওয়া যায়।—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র বা তারকা দীপ্তিমান্ নয়। বিদ্যুৎ ও সেখানে প্রকাশিত হয় না; অগ্নির বা কি কথা? তাঁর জ্যোতিতে এ সকল জ্যোতিষ্ক দীপ্তিমান্ হয়েছে, তাঁর আলোকে এ বিশ্ব আলোকিত।

যিনি পরব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই পুরুষোত্তম। পরমাত্মাই জীবাত্মারূপে দেহে দেহে বিরাজমান। জীবাত্মা পরমাত্মার সনাতন অংশ। জলসূর্য যেমন আসল সূর্য্যের প্রতিবিম্ব মাত্র, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের অভিন্ন অংশ, তেমনি জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।

যখন জীবাত্মা শরীর থেকে উৎক্রান্ত হয় তখন কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং নূতন দেহ আশ্রয় করে। বায়ু যেমন পুষ্পাদি থেকে গন্ধ আহরণ করে তেমনি জীব নবদেহ গ্রহণকালে পূর্বদেহের মন ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে নিয়ে যায়। তাই পূর্ব জন্মের সাধনা

মনে সঞ্চিত থাকে। বিষয়ের আকর্ষণে আমাদের মন বহির্মুখী থাকে বলে আমরা জীবাত্মার শাশ্বত স্বরূপ বুঝতে পারি না। কিন্তু যাঁদের মন তপস্যা ও সংযম দ্বারা সংস্কৃত, সংশুদ্ধ ও অন্তর্মুখী হয়েছে তাঁরাই স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মারূপে, পরব্রহ্মরূপে জানতে পারেন। ব্রহ্মতেজ চন্দ্রে, সূর্যে, অগ্নিতে, পৃথিবীতে ও সর্বভূতে প্রকটিত। ব্রহ্মতেজ উদরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহে বিরাজিত হয়ে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্য পরিপাক করে। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে একই পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। পরমাত্মাই চতুর্বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু।

ইহলোকে তিনটি পুরুষ আছে—ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও উত্তম পুরুষ। সর্বভূতই ক্ষর পুরুষ এবং ইহা কূটস্থ মায়াশক্তি অক্ষর পুরুষ হতে অত্যন্ত ভিন্ন। পুরুষোত্তম পরমাত্মা নামে বেদান্তে অভিহিত। পুরুষোত্তম ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে বিশ্ব পালন করছেন। তিনি বেদে ও কাব্যাদিতে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদে পরং ব্রহ্মকে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। ভক্তিগ্রন্থে আছে যে, ভগবান করুণাবশতঃ নররূপে অবতীর্ণ হন এবং যিনি অর্জুনকে গীতাতত্ত্ব ও স্বীয় ঈশ্বরত্ব বুঝিয়েছিলেন সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণাদি অবতার পুরুষের ব্রহ্মত্ব সদা অক্ষুণ্ণ ও অনাবৃত থাকে বলে তাঁদের পুরুষোত্তম বলা হয়। ঋষি অরবিন্দ গীতার যে মৌলিক ব্যাখ্যা লিখেছেন তাতে তিনি পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুরুষোত্তম সম্বন্ধে তিনি শঙ্করাচার্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

বিশ

দৈব ও আসুর সম্পদ

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতির অপত্য দুই প্রকার—দেবগণ ও অসুরগণ। দেবগণের ইন্দ্রিয়বর্গ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা প্রভাবিত, আর অসুরগণের ইন্দ্রিয়গ্রাম অশাস্ত্রীয় পথে পরিচালিত। দেবতাদের গুণাবলীকে দৈব সম্পদ্ এবং অসুরদের গুণরাশিকে আসুর সম্পদ্ বলা হয়। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে এই দুই প্রকার সম্পদ্ বিবৃত। দৈব সম্পদ্ সাত্ত্বিক ও মোক্ষদায়ক বলে স্পৃহনীয়। আর আসুর সম্পদ বন্ধন সৃষ্টি করে বলে বর্জনীয়।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বল্লেন, "যাঁরা দৈবী প্রকৃতি নিয়ে জন্মেছেন, তাঁদের অভয়, আন্তর শুদ্ধি, ধর্মনিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, স্বাধ্যায়, সারল্য, অহিংসা, তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, সেবার আগ্রহ, পরদোষ প্রকাশে অনিচ্ছা, দীনে দয়া, অলোলুপতা, বাক্যে ও ব্যবহারে মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কাজে লজ্জা, তেজ, অচপলতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, অবৈর ভাব এবং অনভিমান—এই ছাব্বিশটী সদ্‌গুণ লাভ হয়। এই সৎগুণরাজিকে দৈব সম্পদ্ বলে। হে পাণ্ডব, শোক করো না। তুমি দৈব সম্পদের অধিকারী হয়েই জন্মেছ।"

আসুরী প্রকৃতিতে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, বাক্যে ও ব্যবহারে রূক্ষতা এবং কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেক—এই অসৎ গুণগুলি

প্রকাশিত হয়। এগুলিকে আসুর সম্পদ্ বলে। ইহা ভাবী অকল্যাণের অফুরন্ত উৎস। আসুর জনদের ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্মে নিবৃত্তি আসে না। তাদের শৌচ, সদাচার বা সত্যনিষ্ঠা নেই। তারা বলে এ জগৎ সত্যশূন্য, ধর্মহীন ও অনীশ্বর[১]। তাদের বিশ্বাস, জীব কামাসক্ত স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন। তারা অল্পবুদ্ধি, উগ্রকর্মা, অনিষ্টকারী, পরলোকে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক[২]। তাদের দ্বারা জগতের অহিত হয়ে থাকে।

আসুর ব্যক্তিগণের হৃদয় দুষ্পূরণীয় কামনাসমূহে পরিপূর্ণ। তারা অধার্মিক হয়েও নিজেদের ধার্মিক মনে করে এবং অভিমান ও মদে স্ফীত হয়ে মোহবশে অশুভ সংকল্প নিয়ে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তারা কামভোগকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে এবং সে হেতু মৃত্যু পর্যন্ত অপরিমেয় অসৎচিন্তায় মগ্ন থাকে। তারা শত আশাপাশে বদ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয়-সেবা করে। ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য তারা পরস্ব অপহরণাদি অসৎ উপায়ে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাগম, ইন্দ্রিয়-ভোগ, স্বার্থ-সিদ্ধি প্রভৃতি সংকল্পে তাদের চিত্ত সদা বিক্ষিপ্ত থাকে। তারা আত্মশ্লাঘায় এবং পরনিন্দায় আনন্দ পায়, এবং শাস্ত্রবিধি ও ধর্মনীতি লঙ্ঘন করে নামমাত্র সৎকর্মে নিযুক্ত থাকে।

অধুনা যারা জড়বাদী তাদিগকে আমাদের শাস্ত্রে লোকায়তিক বলা হয়েছে। যুগে যুগে জড়বাদ ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানব সমাজে আবির্ভূত হয়। গীতোক্ত আসুর প্রকৃতির যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হলো তা থেকে সহজে বুঝা যাবে, বর্তমান যুগে কারা কারা জনসেবা ও

১ ঈশ্বরহীন।

২ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী।

জগদ্ধিতের মুখোস পরে জড়বাদ প্রচার করছে। আসুর সম্পদ্ ত্যাগ করে দৈব সম্পদ্ গ্রহণের জন্যে শ্রীভগবান অর্জুনকে আসুর প্রকৃতির এই বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। সমস্ত আসুর সম্পদ যে তিনটি রিপুর অন্তর্ভুক্ত এবং যাদের পরিত্যাগে সমস্ত আসুর সম্পদ্ পরিত্যক্ত হয়, সে তিনটি ভগবান নিম্নোক্ত শ্লোকে বলেছেন।—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ তস্মাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এ তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। যাদের এ তিনটি থাকে তাদের অধোগতি হয়, তারা পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। অতএব এ তিনটি বিষবৎ বর্জন করা উচিত।

এগুলি শ্রেয়ঃ পথের প্রতিবন্ধক। এ সকল থেকে মুক্ত হলে মানুষের সৎচিন্তা ও সৎকর্মে প্রবৃত্তি জন্মে। শ্রেয়ঃ পথের পথিক না হলে মনুষ্য জন্মের চরম সার্থকতা লাভ হয় না। কঠোপনিষদে আছে, জীবনের দুটি পথ—একটি শ্রেয়ঃ পথ, অপরটি প্রেয়ঃ পথ। প্রেয়ঃ পথ আপাতমনোরম, কিন্তু পরিণামে অনিষ্টকর। যারা প্রেয়ঃ পথে চলে তারা আসুর সম্পদ্ লাভ করে, আর যাঁরা শ্রেয়ঃ পথে চলেন তাঁরা দৈব সম্পদ প্রাপ্ত হন। কেনোপনিষদে আছে।—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেৎ ইহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।

ইহ জীবনে যদি আত্মস্বরূপ অবগত হওয়া যায় তবেই জীবন সার্থক। যদি তা লাভ না হয় তাহলে মহতী বিনষ্টি, সর্বনাশ ঘটে। দৈব সম্পদ্ লাভ না হলে মানব জীবন ব্যর্থ হয়। আমাদের কোন্‌টি কর্তব্য, বা কোন্‌টি অকর্তব্য, এটি নির্ণয় করতে হলে শাস্ত্রীয় বিধি ও

ও নিষেধ মানতে হয়। স্বেচ্ছাচারী হয়ে শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করলে শ্রেয়ঃ পথে চলা যায় না। আমাদের দেশে যুগে যুগে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে তাঁদের জীবনের পরিপক্ক প্রজ্ঞারাশি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ। এজন্যই শাস্ত্রকে মানতে হয়। সর্ব ধর্মে শাস্ত্র স্বীকৃত ও সম্মানিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বিষ্ণু মন্দিরে ভাবনেত্রে দেখেছিলেন, প্রতিমার ন্যায় ভাগবতও ভগবানের একটি মূর্তি। তাই শিখরা তাদের ধর্মগ্রন্থকে দেবমূর্তি জ্ঞানে পূজা করে। আসামে শ্রীশঙ্করদেবের ভক্তগণ দেবমন্দিরে মূর্তির পরিবর্তে 'ভাগবত' পূজা করেন। শাস্ত্রকে মানলে ভগবানের আদেশ পালন করা হয়।

একুশ

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা

বৈদিক ঋষিগণ নিত্য শ্রদ্ধার আবাহন করতেন। ঋগ্বেদে আছে।—

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে, শ্রদ্ধাং মাধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিম্রুচি, শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ মাং॥

শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আবাহন করি, শ্রদ্ধাকে আমরা মধ্যাহ্নে আবাহন করি। সূর্য্য যখন অস্ত যান, তখনো আমরা শ্রদ্ধাকে আবাহন করি। হে শ্রদ্ধে, এখন আমাদিগকে শ্রদ্ধাময় কর।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবান্, যাঁরা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে, অথচ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজাদি করেন তাঁদের সে নিষ্ঠা কিরূপ?" শ্রীভগবান অর্জুনকে তদুত্তরে বল্‌লেন, "সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সংস্কার অনুসারে মানুষের ত্রিবিধ শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়। যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেরূপই হন। যাঁদের শ্রদ্ধা সাত্বিক, তাঁরা দেবাদির পূজা করেন। যাঁদের শ্রদ্ধা রাজসী, তাঁরা যক্ষরাক্ষসাদির পূজা ভালবাসেন। যাঁদের শ্রদ্ধা তামসী, তাঁরা ভূত-প্রেতাদির পূজায় অনুরক্ত হন। যে যা ভালবাসে সে তার সত্তা বা স্বভাব পায়।"

পূর্বোক্ত তিন প্রকার লোকের আহার, তপস্যা ও দান সকলি ত্রিগুণের ভেদে তিন রকম হয়ে থাকে। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের অষ্টম, নবম, ও দশম শ্লোকে ত্রিবিধ আহার এরূপে বিবৃত হয়েছে।—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাঃ হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

যে সকল আহার আয়ুঃ, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধক এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও মনোরম সেগুলি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯

যে সকল আহার দুঃখ, শোক ও রোগ সৃষ্টি করে এবং অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ম, অতি শুষ্ক ও অতি প্রদাহকর সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিগণের কাম্য।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং ॥১০

মন্দপক্ক, রসহীন, দুর্গন্ধময়, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও পূজাদিতে নিষিদ্ধ আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয়।

রাজসিক ও তামসিক আহার অস্বাস্থ্যকর ও অশুদ্ধিকর বলে বর্জনীয় এবং সাত্ত্বিক আহার স্বাস্থ্যপ্রদ ও আয়ুঃবর্ধক বলে গ্রহণীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে।—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ
ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতির্লম্ভে সর্বগ্রন্থীনাম্ বিপ্রমোক্ষঃ।

আহার শুদ্ধ হলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে। ধ্রুবা স্মৃতির ফলে মানুষ মুক্ত হয়। ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাবান নরনারীগণ স্বপাক ও সাত্ত্বিক ভোজনে প্রীত হন। সাত্ত্বিক আহারে দেহ নীরোগ, সুস্থ ও দীর্ঘায়ুঃ হয় এবং মনের শুদ্ধি ও শক্তি বাড়ে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক লোকের তপস্যাও ত্রিবিধ। আলোচ্য অধ্যায়ে চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোকে যথাক্রমে শারীর, বাচিক ও মানস তপস্যা কথিত। এই তিন প্রকার তপস্যা সাত্ত্বিক মানুষের প্রিয় হয়।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলে।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য কথন এবং বেদাদি শাস্ত্র পাঠকে বাচিক তপস্যা বলে।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, বাকসংযম, মনের নিরোধ, ব্যবহারকালে ছলনারাহিত্য (অকপটতা)—এ সকলকে মানস তপস্যা বলে।

সত্যকথন এক প্রকার বাঙ্ময় তপস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'সত্য কথন কলির তপস্যা।' তিনি জগদম্বার চরণে ধর্মকর্ম, পাপপুণ্য, ভালমন্দ প্রভৃতি সমস্ত অর্পণ করলেন ; কিন্তু সত্য দিলেন না। কারণ সত্য দিলে তিনি কি নিয়ে থাকবেন ? একটা সত্য কথা বল্লে সত্যস্বরূপ ভগবানের দিকে এক পা এগিয়ে যাওয়া যায়। সত্য কথনে মনের জোর বাড়ে। বার বৎসর সত্য কথা বল্লে যা মুখ থেকে বেরোয় তাই ফলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবনে কখনো মিথ্যা বলেন নি, কখনো

সত্যের অপলাপ করেন নি। তাই তিনি যা বলতেন তাই সত্য হতো।

রাজসিক ব্যক্তিগণ সাধুবাদ, সম্মান ও পূজা পাবার জন্য তপস্যা করেন। দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে, দেহেন্দ্রিয়কে কষ্ট দিয়ে, অপরের অনিষ্ট কামনা করে তামসিক ব্যক্তিগণ তপস্যারত হন।

ত্রিগুণভেদে দানও তিন প্রকার হয়। এই অধ্যায়ের বিশ, একুশ ও বাইশ শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস দান বর্ণিত।—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

'দান করা কর্তব্য'—এই ভাবে প্রত্যুপকারের আশা ছেড়ে পুণ্য স্থানে, শুভ সময়ে ও যোগ্য পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলে।

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১

যে দান প্রত্যুপকারের আশায় ও কোন পারলৌকিক ফললাভের উদ্দেশ্যে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে করা হয়, তাকে রাজসিক দান বলে।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥২২

অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে, ও অযোগ্য পাত্রে অবজ্ঞাপূর্বক ও প্রিয় বচনাদি সৎকাররহিত যে দান করা হয়, তাকে তামসিক দান বলে।

তপস্যা ও দানাদি শ্রদ্ধার সহিত না করলে কোন ফল লাভ হয় না। শ্রদ্ধার অভাব হলে মনের শক্তি কমে যায়। শ্রদ্ধাশীল হয়ে যা কিছু করা যায় তা জীবনকে সবল, সমৃদ্ধ করে ও ফলপ্রদ হয়।

গীতায় অন্যত্র আছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "নচিকেতার মত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে জীবনে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে উঠে।" শ্রদ্ধাই জীবনের শ্রেষ্ঠ শোভা। শ্রদ্ধা অন্তরে অধিষ্ঠিত হলে জীবন শোভাময় হয়, কথাবার্তা সুশ্রাব্য ও চালচলন সুদৃশ্য হয়। মাতা, পিতা, শিক্ষক, সাধু, বয়োবৃদ্ধ প্রভৃতি গুরুজন কাছে এলে উঠে দাঁড়ানো এবং তাঁদের সঙ্গে আলাপাদির সময় শিষ্টাচার দেখানো প্রভৃতি শ্রদ্ধাশীলের লক্ষণ।

শৌচ এবং দান সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা দরকার। শৌচ এক প্রকার শারীর তপস্যা। মাটী ও জল দিয়ে আমরা সাধারণতঃ দেহকে শুদ্ধ করি। মূত্রত্যাগ করে জল এবং মলত্যাগান্তে মাটী বা সাবান ব্যবহার করা উচিত। নিত্য স্নানও এক প্রকার শারীর শৌচ। ভাব-সংশুদ্ধি মানস শৌচ। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানস শুদ্ধির জন্য এ'সকল শৌচ অপরিহার্য্য।

দানাদি বিষয়ে গীতার উপদেশ অতুলনীয়। আজকাল যে ভাবে দান করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা গীতোক্ত বিধির অনুযায়ী নয়। সন্ত কবীর বলেছেন—

কবীরা গুরুকে মিলনকী শুনি বাত হাম দোয়।
কুই সাহেবকা নাম লেয় কই কর উঁচা হোয়॥

কবীর শ্রীগুরুর সহিত মিলনের দুটা উপায় শুনেছে। কেউ ঈশ্বরের নাম নেয়, কেউ বা হাত উঁচু (দান) করে। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবী বলতেন, "যার নাই সে জপুক, যার আছে সে মাপুক অর্থাৎ দান করুক।"

যিশু খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "ডান হাতে অপরকে যা দেবে তা যেন

বাঁ হাত জানতে না পারে।" খ্রীষ্টবাণীর তাৎপর্য্য এই যে, লোক দেখিয়ে বা অবজ্ঞার সহিত দান করা উচিত নয়। দানের মত পুণ্য কাজ কলিকালে আর নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌তেন, "দাতা গ্রহীতার সামনে হাঁটু গেড়ে দান করে ধন্য হোক্। দাতা যেন নিজেকে বড় বা গ্রহীতাকে ছোট মনে না করেন। জগতের যারা দীনহীন তারা আমাদিগকে দানের সুযোগ দেবার জন্য এই দুরবস্থা বরণ করে নিয়েছে। তাই গ্রহীতা দাতার নিকট কৃতজ্ঞ না হয়ে দাতাই গ্রহীতার কাছে কৃতজ্ঞ হোক।" দানের এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা স্বামীজির মত আর কেউ দেন নি।

উপরোক্ত ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা এ অধ্যায়ে বলা দরকার। ব্রহ্মচর্য্য এক প্রকার শারীর তপস্যা। ব্রহ্মচর্য্য কথাটা কিশোর-কিশোরীরা প্রায়শঃ শুনলেও এর প্রকৃত অর্থ তারা অনেকেই জানে না। ব্রহ্মচর্য্যের আসল অর্থ বীর্য্যধারণ। কায়মনোবাক্যে বীর্য্যধারণকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতুতে মানবদেহ গঠিত। শুক্রের অন্য নাম বীর্য্য। শুক্র সংরক্ষণের নামই ব্রহ্মচর্য্য। আমরা যা খাই তার সারাংশ রসে পরিণত হয়। রস হতে রক্ত, রক্ত হতে মাংস, মাংস হতে মেদ, মেদ হতে অস্থি, অস্থি হতে মজ্জা এবং মজ্জা হতে শুক্র সৃষ্ট হয়। সুতরাং শুক্রই শরীরের সূক্ষ্মতম ধাতু। শুক্র যতই সঞ্চিত হয় ততই শরীর সবল, সুপুষ্ট ও সতেজ হয়। তাই শাস্ত্রকার বলেছেন—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ক্রিয়তাং বিন্দুধারণম্॥

বীর্য্যক্ষয় মৃত্যুতুল্য এবং বীর্য্যধারণ প্রাণপ্রদ ও আয়ুবর্দ্ধক। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে বীর্যধারণের চেষ্টা করা উচিত।

শিব সংহিতায় বীর্যধারণকে প্রকৃষ্ট তপস্যা বলা হয়েছে। এতে আছে।—

ন তপস্তপ ইত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎযস্তু স দেবঃ নতু মানুষঃ ॥

বীর্য্যধারণ উত্তম তপস্যা। এর তুল্য তপস্যা আর নাই। যিনি ঊর্দ্ধরেতা, কায়মনোবাক্যে বীর্য্যধারণ করেন তিনি দেবতুল্য, তিনি সাধারণ মানুষ নন।

ব্রহ্মচর্য্যের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা অন্য ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়।—

শ্রবণং কীর্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং
সঙ্কল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ।
এতন্মৈথুনং অষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিনঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যং অনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥

যৌন বিষয়ক শ্রবণ, আলোচনা, ক্রীড়া, দৃষ্টিপাত, গোপনে আলাপ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান—এই আট প্রকার কার্য্যকে মনীষিগণ মৈথুন বলেন। এর বিপরীতকে ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্য-ধারণ বলা হয়। কল্যাণকামিগণ কর্তৃক এই তপস্যা সর্বাবস্থায় অনুষ্ঠেয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম, জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি কৈশোরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কিশোর-কিশোরীরা যতই বীর্য্যধারণে প্রযত্ন করবে ততই তারা স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভে সমর্থ হবে।

বাইশ

মুক্তির পথ

পৃথিবীতে বা স্বর্গে এমন কোন মানুষ বা দেবতা নেই যিনি সত্ত্ব, রজঃ বা তমো গুণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই তিন গুণ অনুসারে মানুষের প্রকৃতিও সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী হয়। এই ত্রিগুণভেদে ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম ও সুখ ত্রিবিধ হয়ে থাকে।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত ত্রিবিধ ভেদ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ত্যাগও ত্রিগুণভেদে তিন প্রকার। কর্ম দুঃখকর মনে করে যিনি কায়ঃক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগী হন তাঁর ত্যাগ রাজসিক। অবশ্য কর্তব্য নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ নিত্যকর্ম চিত্তশুদ্ধিকর। মোহবশে নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে। কর্তৃত্বের অভিমান এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কেবল কর্তব্যবোধে বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে।

কোন দেহধারী নিঃশেষে সর্বকর্ম ত্যাগ করতে পারেন না। তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন তিনিই ত্যাগী, তিনিই সন্ন্যাসী। যিনি ত্যাগী তিনি অশুভ কর্মে দ্বেষ করেন না, বা শুভ কর্মে আসক্ত হন না। তিনি সংশয়-শূন্য, সাত্ত্বিক, মেধাবী হন। যে মেধা দ্বারা ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হন তাকে বেদে ব্রহ্ম-মেধা বলা হয়েছে। সত্ত্বগুণী মানুষের সেই ব্রহ্ম-মেধা লাভ হয়। তখন বিষয়চিন্তা আলুনী লাগে, ব্রহ্মচিন্তায় মন বসে। গীতার মতে ইহাই মুক্তির পথ।

যিনি মুক্ত পুরুষ তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ,

মুক্ত আত্মা, তিনি অকর্তা। তিনি জানেন, শরীর, অহংকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল কর্মের কর্তা ও ভোক্তা ; তাঁর অহংকৃত ভাব নেই, তাঁর বুদ্ধি কোন বিষয়ে লিপ্ত হয় না। তিনি জগতের সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করলেও হন্তা হন না, বা হত্যার ফলে বাঁধা পড়েন না। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি হন্তা, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি অহন্তা, তিনি অকর্তা।

যেমন তৈমিরিক রোগী এক চন্দ্রকে বহু রূপে দেখেন, যেমন লোকে গতিশীল মেঘের মধ্যে স্থির চন্দ্রকে গতিবান মনে করে, বা যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং গতিবান্ যানবাহনে বসে অন্য স্থির যানবাহনকে গতিবান মনে করে, তেমনি মূঢ় ব্যক্তি নিজেকে সকল কর্মের কর্তা ভাবে।

ত্রিগুণ-ভেদে জ্ঞানও তিন প্রকার। যে জ্ঞান দ্বারা সর্বভূতে এক অব্যয় সত্তা দৃষ্ট হয় সেই অদ্বৈত জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানে সংসার-নিবৃত্তি হয়, মুক্তি-লাভ ঘটে। কিন্তু যে জ্ঞান দ্বারা প্রতিদেহে পৃথকবিধ, পরস্পরবিলক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার দর্শন হয় তাকে রাজসিক জ্ঞান বলে। তামসিক জ্ঞানে একটি মাত্র দেহে বা প্রতিমাতে সমগ্র আত্মা বা ঈশ্বর আছেন—এরূপ অভিনিবেশ হয়। এই জ্ঞান অতি তুচ্ছ, অযথার্থ ও অযৌক্তিক। তামসিক ব্যক্তি মনে করে, দেহস্থ আত্মা দেহপরিমাণ এবং প্রতিমাস্থ দেবতা বিগ্রহ-পরিমিত মাত্র।

ত্রিগুণ-ভেদে কর্মও তিন প্রকার। কর্মফলে অভিলাষশূন্য ব্যক্তি অনাসক্তভাবে যজ্ঞদানাদি যে নিত্যকর্ম করেন তা সাত্ত্বিক। ফলের কামনা করে বা অহংকারী হয়ে বহুল আয়াসে যে কর্ম সকল অনুষ্ঠিত

হয় সেগুলি রাজসিক। ভাবী শুভ বা অশুভ ফল, অর্থব্যয় বা শক্তিক্ষয়, পরপীড়া ও স্বায় পৌরুষ বিচার না করে মোহবশে যে কর্ম করা হয় তাকে তামসিক কর্ম বলে।

সাত্ত্বিক কর্তা কর্মফলে অনাসক্ত, কর্তৃত্বের অভিমানশূন্য, ধৃতিশীল ও উদ্যমযুক্ত, কর্মের সিদ্ধিতে হর্ষহীন বা অসিদ্ধিতে বিষাদশূন্য। রাজসিক কর্তা বাসনাকুল, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, পরদ্রব্যে লোভী এবং তীর্থাদি স্থানে দানে অনিচ্ছুক, পরপীড়ক, বাহ্য বা আন্তর শৌচহীন এবং হর্ষশোকান্বিত। তামসিক কর্তা অসমাহিত, বালকবৎ অত্যন্ত প্রাকৃত, অনম্র, শঠ, স্বার্থপর, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী। দীর্ঘসূত্রিতা তমোগুণের লক্ষণ। এটি সর্বথা পরিহার্য। গুণভেদে সুখও তিন প্রকার।—

যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭

যে সুখ প্রথমে বিষতুল্য, দুঃখাত্মক; কিন্তু শেষে অমৃততুল্য, প্রীতিকর, আত্মনিষ্ঠ, এবং বুদ্ধির নির্মলতা হতে প্রসূত তা সাত্ত্বিক। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধ্যানাদি দ্বারা লভ্য বলে সাত্ত্বিক সুখ শ্রমসাধ্য ও দুর্লভ। সাত্ত্বিক সুখ জলবৎ স্বচ্ছ, শীতল, মৃদু ও স্থায়ী।

যে সুখ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন এবং অগ্রে সুখকর ও পরিণামে বিষতুল্য তা রাজসিক। এই সুখ বল, বীর্য, রূপ, প্রজ্ঞা, মেধা, ধন ও উৎসাহ নষ্ট করে। যে সুখ অগ্রে ও শেষে মানুষকে মূঢ় করে এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উদ্ভূত হয় তা তামসিক।

'স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।'

স্ব স্ব কর্মে নিষ্কামভাবে নিযুক্ত থাকলে মানুষ সিদ্ধি বা মুক্তি লাভ করতে পারে। ইহাই গীতার মর্মবাণী। ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়ায়,

শ্রমিক শ্রমকার্যে, চিকিৎসক চিকিৎসায়, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে, শিক্ষক শিক্ষাদানে, সেবক সেবায়, কুলী ভারবহনে, চালক বাহন চালনে, কৃষক কৃষিকর্মে নিষ্কামভাবে নিযুক্ত হলে জীবনে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। গীতার মত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ মানুষকে এমন উদার অভয় বাণী শোনাতে পারেনি।

গীতার শেষ অধ্যায়ে তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্য নির্ণীত হয়েছে। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বানুভূতি ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক। ক্ষাত্র স্বভাবে শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধ হইতে অপলায়ন, দানে মুক্তহস্ততা ও শাসনক্ষমতা প্রকটিত হয়। বৈশ্য স্বভাবে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য এবং শূদ্র চরিত্রে পরিচর্যাদি কর্ম প্রবল হয়।

আপস্তম্ব স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলম্ অনুভূয় ততঃ শেষেন বিশিষ্ট-দেশ-জাতি-কুল-ধর্মায়ুঃ-শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখ-মেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।" স্বকর্মনিষ্ঠ বর্ণিগণ ও আশ্রমিগণ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে পুণ্যফল ভোগ করে অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মের পুঁটলি মনের মধ্যে নিয়ে বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, ধর্ম, আয়ুঃ, বিদ্যা, শীল, সম্পদ, সুখ, মেধা সহিত ভূমিষ্ঠ হন।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, "স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"। স্বকর্ম দ্বারা তাঁকে, ঈশ্বরকে অর্চনা করলে মানুষ সিদ্ধি বা মুক্তি লাভ করে। কেবল যে বর্ণাশ্রমের কর্ম দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়, বর্ণাশ্রমবিহীনদের মুক্তি লাভ হয় না, এমন নয়। আর্য-অনার্য, স্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই মুক্তিলাভে, আত্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় মানবিক অধিকার আছে। রৈক, বাচক্লবী, সংবর্ত প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত হয়েও

মুক্তিলাভ করেছিলেন। জন্মান্তরে সঞ্চিত সুকৃতি দ্বারাও মুক্তি লাভ হয়। মনুসংহিতায় আছে, "ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-সংযম, মেধা, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এ দশটি সাধারণ ধর্ম সকলের আচরণীয়।" এ সকল ধর্মাচরণের দ্বারা সকলে মুক্তিপথের পথিক হতে পারে।

শ্রীভগবান অর্জুনকে গীতার তৃতীয় ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, বর্ণবিহিত ও আশ্রমগত ধর্ম অঙ্গহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হ'লেও সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ স্বভাবজ কর্ম করলে মানুষ পাপভাগী হয় না।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভাঃ হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, "হে কুন্তিপুত্র, দোষযুক্ত বা অপ্রীতিকর হলেও জন্মনির্দিষ্ট স্বধর্ম ও স্বকর্ম ছাড়া উচিত নয়। কারণ অগ্নি যেমন ধূমে আবৃত থাকে তেমনি স্বধর্ম বা পরধর্ম সকল ধর্মই অল্প বিস্তর দোষযুক্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগের কৌশলটী সংক্ষেপে এক কথায় এই ভাবে বলেছেন, Neither seek nor avoid. অর্থাৎ কোন কাজ এড়িও না, কোন কাজ অন্বেষণ করো না। যা সামনে আসে তা নিষ্কাম ভাবে কর, তাতে চিত্ত শুদ্ধ ও মুক্তি লাভ হবে।

সকল কর্তব্য অনাসক্তভাবে, সংযত চিত্তে অনুষ্ঠান করলে নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি বা মুক্তিলাভ হয়। গীতার প্রখ্যাত টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে ইহাই পরমহংস-চর্য্যা, অর্থাৎ প্রকৃত সন্ন্যাসী বা পরমহংসের অবস্থা।

নিষ্কামভাবে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করলে কিরূপে মুক্তিলাভ হয়

সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। কোন ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের বইতে এ গল্পটি পড়েছিলাম। কোন বাজিকর সারা জীবন বাজি দেখিয়ে কাটিয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে তার ধর্মসাধনের ইচ্ছা হলো। তাই সে একটি ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মঠে যোগ দেয়। উক্ত মঠে থাকবার সময় তার উপর ভার পড়লো গীর্জা পরিষ্কার রাখবার। সে সযত্নে যথাসময়ে গীর্জা ঝাঁট দিত ও সাফ করতো এবং সন্ধ্যায় প্রার্থনাদিতে যোগ দিত। পণ্ডিত সন্ন্যাসীরা ধ্যানজপে ও শাস্ত্রপাঠে সকাল সন্ধ্যা ডুবে যেত। কিন্তু বৃদ্ধ বাজিকর জপধ্যান করতে আরম্ভ করলেই সারা জীবন সে যা করেছে তা মনে ভেসে উঠতো। তার ধর্মজীবন সম্বন্ধে সে তাই চিন্তিত হয়ে পড়লো। অন্তরের অদম্য প্রেরণায় সে একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলো। মঠবাসীরা যখন আহারান্তে ঘুমিয়ে পড়তো, তখন বাজিকর গোপনে গীর্জায় ঢুকে জীশু-মাতা মেরীর মূর্তির সামনে বাজি দেখাতো এবং তাঁকে প্রার্থনা করতো, "আমি যা সারা জীবন করেছি তা দিয়েই তোমার পূজা করবো। আমি জপ ধ্যান করতে পারি না বলে তুমি কি আমাকে কৃপা করবে না, আমাকে দেখা দেবে না?" প্রার্থনা আন্তরিক হলে অচিরে পূর্ণ হয়। কিছু দিন এভাবে বাজি দেখাবার পর বাজিকর একদিন দেখলো, মাতা মেরী জীশুকে কোলে নিয়ে হাস্য মুখে তার বাজী দেখছেন। মঠবাসীরা রোজ রাত্রে বিছানায় তাকে না দেখতে পেয়ে তার সন্ধান করতেন। এক রাত্রে তাঁরা গীর্জার মধ্যে শব্দ শুনে জানলার খড়খড়ি খুলে সব দেখতে পেলেন ও স্তম্ভিত হলেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, গীতোক্ত বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য।

— মুক্ত পুরুষ সর্বভূতে সমদর্শী, ব্রহ্মভূত, সুপ্রসন্ন, শোকমুক্ত ও

কামনাহীন। তিনি নিরহংকার, নির্মম, প্রশান্ত, অল্পাহারী, বিবিক্তসেবী, ধ্যানপরায়ণ, বৈরাগ্যবান্, বিশ্বপ্রেমিক এবং সর্বভূতহিতে রত হন।

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বল্লেন, "আমাতে চিত্ত অর্পণ করে নিষ্কাম হয়ে যদি তুমি তোমার স্বধর্ম পালন করো তাহলে দুস্তর সংসার-সাগর সহজে অতিক্রম করতে পারবে। আর যদি তুমি আমার কথা না শোনো, তবে পুরুষার্থের অযোগ্য হয়ে পড়বে। অহংকারী হয়ে যদি তুমি স্থির করো, আমি যুদ্ধ করবো না, তাহলে তুমি স্বধর্মচ্যুত হবে। তোমার ক্ষাত্র স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে প্রণোদিত করবে। হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ যা করতে ইচ্ছা করছো না তা স্বীয় স্বভাবের প্রেরণায় অবশ হয়ে করতে বাধ্য হবে। কারণ স্বভাবজাত কর্ম দ্বারাই মানুষ যন্ত্রবৎ চালিত হয়।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১

হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়ার দ্বারা চালিত করছেন।
কঠোপনিষদে আছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ বিষয়ান্ তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুঃ মনীষিণঃ ॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলে জানবে। মনীষিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য

বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়-গমনের পথ এবং দেহেন্দ্রিয়মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলে থাকেন।

বাইবেলে আছে, জিশু খ্রীষ্ট নরদেহকে ঈশ্বরের মন্দির বলতেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২

হে ভারত, তুমি সর্বভাবে কায়মনোবাক্যে তাঁরই শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরম শান্তি ও চরম মুক্তি লাভ করবে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণাগত হও। তাহলে আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো। অতএব শোক করো না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলছেন—

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও। তিনি ভক্তিভরে আরাধিতা হলে মানুষকে ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গ ও মুক্তি দাত্রী হন।

সমগ্র গীতা উপদেশ দেবার পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে পার্থ, তুমি কি একাগ্র চিত্তে আমার মুখ থেকে এই গীতা শুনলে? হে ধনঞ্জয়, গীতা শুনে তোমার মোহনাশ হয়েছে কি?" উত্তরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে করযোড়ে বললেন, "হে অচ্যুত, আপনার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট এবং আত্মবিষয়ক ধ্রুবা স্মৃতি লাভ

হয়েছে। আমি নিঃসংশয় হয়েছি। এখন আমি আপনার উপদেশ পালন করতে প্রস্তুত।"

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বল্‌লেন, "আমি এরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শুনলাম। আমি বেদব্যাসের কৃপায় দিব্যচক্ষু পেয়ে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে গীতা শুনে আপনাকে বলেছি। হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনের এই পুণ্য কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত ও আনন্দিত হচ্ছি। ভগবানের সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ বার বার আমার মনে ভেসে উঠছে। যে পক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধনুর্ধর পার্থ আছেন সে পক্ষেই রাজ্যশ্রী, যুদ্ধজয়, অভ্যুদয় ও ধ্রুবা নীতি বিরাজ করে, ইহা আমার সুনিশ্চিত অভিমত।"

"কুরুক্ষেত্রে যে রণনদী প্রবাহিত হয়েছিল ভীষ্ম ও দ্রোণ তার দুটি তীর, জয়দ্রথ জল, গান্ধাররাজ নীল প্রস্তর, শল্য কুম্ভীর, কৃপ খরস্রোত, কর্ণ উত্তাল তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ দুটি ভয়ঙ্কর মকর এবং দুর্যোধন আবর্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায় পাণ্ডবগণ সেই রণনদী উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন।" ওঁ তৎ সৎ।

সমাপ্ত